সাবমেরিণের চোখ

[পেরিস্কোপের তলার ডায়েলে সমুদ্রের উপরকার ছবি।
ছবিতে ডকের ধারের ঘরবাড়ী রাস্তাঘাট, লাইটপোষ্ট, সমুদ্রের জল ইত্যাদি
দেখা যাচ্ছে। ঠিক করবার সুবিধার জন্য
ডায়েলটি ডিগ্রীতে ভাগ করা।]

লড়ায়ের নতুন কায়দা

শ্রীহারাধন বক্সী

প্রকাশক
শ্রীরামেশ্বর দে
চন্দননগর

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৩২

মূল্য বার আনা]

কলিকাতা, ১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট
"মানসী প্রেস"
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

লড়ায়ের নতুন কায়দা

প্রথম অধ্যায়

সেকেলে ও একেলে লড়াই

সেকেলে ও একেলে লড়াই—এর মধ্যে আমরা ঠিক কেমন করে' এককোপে গলাটা কেটে ফেলতে হয়, অথবা পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে একটা লোহার টুকরো এনে গরম-গরম মানুষের কল্‌জের ভেতর বসিয়ে দিতে হয়, কিম্বা হাওয়ায় বিষ ছড়িয়ে স্থলচর, জলচর ও খেচর জীবকে মুখ দিয়ে রক্ত তুলে মারতে হয়—তার কথা বলব না। কিন্তু আমরা যুদ্ধের কায়দার এই অদল-বদল দিয়ে মানুষের মনটা কেমন-কেমন বদলাচ্ছে, কেমন মন নিয়ে সেকালে বীর সাজা চলত, এবং তার চাইতে কত বড় ও শক্ত মন নিয়ে আজ দেশসুদ্ধ লোককে, এমনকি মেয়েমানুষদেরও যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটতে হয়, এইসব মনের কথাই এখানে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব। যুদ্ধের কায়দার পরিবর্ত্তনের কথাটা হবে আমাদের back-ground, তার উপরে আমরা আঁকব সেকেলে ও একেলে যোদ্ধার মনস্তত্ব। তবে back-groundটা প্রস্তুত করবার দিকেও স্থানানুযায়ী, আমরা যত্ন নিতে ত্রুটী করব না।

বিগত যুদ্ধটা মানুষের সমাজ, রাজনীতি এমনকি ব্যক্তিগত জীবনকেও বড় কম নাড়া দিয়ে যায় নি। এই যুদ্ধের ভেতর দিয়ে সমগ্র পৃথিবীটা আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অস্ত্র সজ্জা, যুদ্ধের কায়দা, লড়ায়ের শাস্ত্র, নীতি, অধিকার, রীতি ও লোকমত এই চারবৎসর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে একেবারে কোথায় কি উল্টে-পাল্টে গেছে তার আর ঠিক নেই। ফরাসী-বিপ্লবও বোধ হয় মানুষের জীবনে এতটা পরিবর্ত্তন আন্‌তে পারে নি।

বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে নিবিষ্টভাবে আলোচনা করবার আগে আমরা মোটামুটি যুদ্ধের ক্রমবিবর্ত্তনটা বুঝতে চেষ্টা করব। তারপর কয়েকটি প্রবন্ধে পরিবর্ত্তনগুলির অল্পবিস্তর আলোচনা করব।

যুদ্ধের পরিবর্ত্তনটা সুধু একজায়গায় হয় নি। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, সমুদ্র গর্ভে, মৃত্তিকাভ্যন্তরে—যুদ্ধটা কোথায় যে গড়ায় নি তা বলাই শক্ত। পদাতি, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ, নাবিক—সকল সৈন্যদলেরই কর্ম্ম ও মূল্য বদলে গেছে। এখনও যে লোকে বন্দুকের নাম করে, তলোয়ারের নাম করে, হাতী ঘোড়া উটের নাম করে,—সেটা কেবল পুরাতন সংস্কার মাত্র। যুদ্ধটাকে যে লোকে এখনও কেন ইঞ্জিনিয়ারীং, ম্যানুফ্যাকচারিং, রেল-মটর প্রতিযোগীতা, মেক্যানিক্স, মাটীকোপান অথবা কাঙ্গালী-ভোজন নাম দেয় নি, তাই আমরা ভেবে ঠিক করতে পারি না। জেনারেলদের কেন যে ম্যানেজার নাম দেওয়া হয় নি, সেইটাই আশ্চর্য্য। কমাণ্ডার-ইন্-চিফকে যে এখনও কেন আমরা স্থানুলিঙ্গ অথবা পাকা দাবাড়ী কিম্বা টেলিফোনিষ্ট নাম দিচ্ছি না তা'ত জানি না।

"ষ্টেটমেজর ষ্টাফকে" যে কেন কবি-সঙ্ঘ বলি না এইটাই আমাদের ভুল। তারপর আমাদের সব চাইতে ভুল হয় তখন, যখন আমরা বলি—"ঐ ভার্দ্দুনে যুদ্ধ হচ্ছে।" তার বদলে নিশ্চয়ই আমাদের বলা উচিত সেন্তএনিয়্যানের কারখানায় কিংবা শ্রীমতী সৈন্যবণিতা গোলক-নির্ম্মাণকারিণীর বুকের উপর যুদ্ধ হচ্ছে। কারণ কারখানা বন্ধ হ'লে—যুদ্ধে হার অনিবার্য্য। এবং গোলক নির্ম্মাণকারিণীদের হৃদয় ভাঙ্গলে তাদের প্রিয়তমদেরও মন ভাঙ্গতে দেরী হবে না। অন্ততঃ ভার্দ্দুনে যুদ্ধ হচ্ছে না বলে' যদি আমরা বলি প্যারিসে যুদ্ধ হচ্ছে, তাহলেও কতকটা ঠিক কথা বলা হয়। কেননা প্যারিসই ফ্রান্সের আত্মা। এমনকি ভার্দ্দুনের যুদ্ধের সময় বেলজিয়মে যুদ্ধ হচ্ছে বল্লেও তার অন্ততঃ একটা আধ্যাত্মিক মানে করা যায়! এ যুদ্ধে সত্যই জীবিতের চাইতে মৃতের আত্মারা বেশী লড়েছে। বগলে থার্ম্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখে—কিন্তু থার্ম্মোমিটারের জ্বর হয়েছে কি বলা চলে? অন্তরে যা হচ্ছে ভার্দ্দুন তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র—সেখানে লড়ায়ের থারমো-মিটারে অন্তরের অবস্থাই নির্দ্দেশ করেছে। থার্ম্মোমিটারের যদি জ্বর হতো, ভার্দ্দুনেও তাহলে যুদ্ধ হচ্ছে বলা চলত।

এতো গেল সব ছোটখাট ভুল! কিন্তু যে ভুলের আর ক্ষমা নেই সেটা হচ্ছে এই যে, আমরা এখনও দুলাখ লোক মেরে, কিম্বা দুটো লড়াই জিতে মনে করি যে এইবার বাছাধনরা গেল আর কি! এর চাইতে বড় ভুল আর কিছু থাকতে পারে না।

বিগত যুদ্ধে ধরিত্রীর ভার অপনোদনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভুলের ভারটাও কম অপনোদিত হয় নি!

স্থল যুদ্ধের প্রধান পরিবর্ত্তন হয়েছে এই যে আর আলেক-

জান্দারের মত এক লাখ সৈন্য নিয়ে দিগ্বিজয়ে বার হওয়া চলে না। এখন প্রেতি দলে অন্ততঃ দশ বিশ লাখ বা কোটী লোকই লড়তে আসে। কেবল ভীমার্জ্জুন বেছেই আজ যুদ্ধ হয় না—অ্যাং, ব্যাং, চ্যাং, কৈ, খল্‌সে—কারুর আর এই যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণ নেই। আবার এদের সকলেরই একটা দামী দামী কাজও আছে। ব্যাং হয় ত loading unloading করে, চ্যাং হয়ত সাইক্লিষ্ট, কৈ গাছের উপর উঠে দূর্ব্বীণ কসে, আর খলসে baseএ জিয়ন থাকে। অ্যাং কেবল এগিয়ে গিয়ে লড়ে, বাকী সবই "তাই-রে-নারে-না"। কিন্তু ঐ "তাই-রে-নারে-না"র গুণটুকু আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বাঙ্গালী বুঝতে পারব না। আমাদের দেশে যত যত যুদ্ধ হয়েছে, তা'তে আমাদের কর্ত্তারা সূর্য্যচাকা ঢাল, লম্বা তলদার বর্শা, আর হাতী ঘোড়া মানুষ লক্ষ লক্ষ কত কিই নিয়ে গেছেন। তবে কেবল তাঁরা যুদ্ধ করবার সময় পিছনে কিছু Reserve রেখে যেতে সব বারেই ভুলে গেছেন। কিন্তু বাবর, তৈমুর, ইব্রাহিম সকলেই সব ভুল্‌লেও, ঐটা কখনো ভুলতেন না। তাই তাঁদের একটা যায়গায় হার হ'লেও, পিছন থেকে আবার সৈন্য এনে লড়ে যেতে পারতেন। আর আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা তখন একটী অগ্নিকুণ্ডে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করে' কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী ফিরতেন। এ মনস্তত্ত্ব আমাদের এখনও যায় নি। ৫০০৲ টাকা পেলেই আমরা ৫০০৲ টাকার তাঁত চরকা কিনে factory খুলে দি। আমরা একবার ভাবি না, factoryটা দাঁড়ান পর্য্যন্ত কি খাব, কিসে ঘরভাড়া দেব। যুদ্ধের মত ব্যবসায়েও যে একটা Reserve force বা ক্যাপিটাল দরকার তা আমরা জানি না, মানি না। তাই আমাদের ব্যবসায়ে এত উন্নতি! "অপায়শ্চাপি

চিন্তয়েৎ” এটা বিশ্বাস করা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ!—কৈ খলসে আদি “তাই-রে-নারে-না”র দল হচ্ছে এই Reserve ও Auxiliary force!

তারপর আর একটা মস্ত বড় পরিবর্ত্তন এই যে, এখন আর এক যায়গায় যুদ্ধ হয় না। হাজার হাজার মাইল ব্যেপে খণ্ড খণ্ড ভাবে সর্ব্বত্র দিবারাত্র যুদ্ধ চলেছে। সেখানে গোরার বাদ্যিও বাজে না, দুন্দুভি পাঞ্চজন্য নিনাদও শোনা যায় না। ও রকম শব্দ করলে সেখানে নিজের লোকেই গুলি করে' দেবে। সেখানে মুখটা বুঁজে দাঁতে দাঁত দিয়ে বৎসরের পর বৎসর মানুষে মানুষে কামড়াকামড়ি করছে। কবি গেয়েছেন “সেথায় গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিজয় বাদ্য বাজে!” একটু আধটু আর্ত্তনাদ কখনো কখনো শুনতে পেলেও বিজয়বাদ্য বাজন সেখানে একেবারেই Sedition!

এই হাজার হাজার মাইল লম্বা যুদ্ধক্ষেত্রে লোকেরা খাত কেটে তার আড়াল থেকে লড়াই করে। প্রধান সেনাপতির এক মাত্র কাজ টেলিফোনে যুদ্ধের সব খবরগুলো শুনে নিয়ে এধারে-ওধারে খবর পাঠান—“ঐখানে পাঁচ লাখ সেনা জড় কর, ঐখানে Reinforcement পাঠাও—ঐখানটায় ভয় বেশী, অতএব ঐখান থেকে এক পা'ও নড় না—ঐখানটায় শত্রুর বল কম, মার ঐখানে গুঁতো!” অধিকাংশ সময় তাঁদের আজ্ঞাটা দু তিনটী শব্দের একটী বাক্যের চাইতে বড় হয় না। কিন্তু এই দু তিনটী শব্দের জন্য হয়ত দু তিন লাখ লোককে সেখানে দাঁড়িয়ে মরতে হয়।

পূর্ব্বের কামানে মাত্র কয়েক শত গজ দূরে, আন্দাজী ঢিল-মারার মত গোলা ছোঁড়া হ'ত। তা'তে ধ্বংসটা হ'ত বড়ই কম।

কিন্তু আজকাল পাহাড়, বন, জনপদের আড়াল থেকে ১০, ২০ এমন কি ৪০, ৫০ মাইল দূরে ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ shell নিক্ষেপ করে' কামান আজ যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে একটী গোলা ছুঁড়তে কয়েক মিনিট সময় লাগত, এখন কিন্তু মিনিটে ৩০।৪০টা ১৷৷০ হাত লম্বা গোলা ছোঁড়বারও ব্যবস্থা হয়েছে। আর এই Shell-এর ক্ষমতাও বড় কম নয়—একটা শেল ফাটলে সেটা ২০০০ টুকরো হয়ে যায় এবং ২০০ গজের মধ্যে তার একটা টুকরো মানুষের সুবিধামত যায়গায় লাগলে তাকে তৎক্ষণাৎ দু টুকরো করে' ফেলে দেয়! তখন যাকে লোকে বলত অনতিক্রম্য ব্যবধান বা অলঙ্ঘ্য গিরিদুর্গ, সেগুলো আজ কামানের সামনে কয়েক দিনের মধ্যেই ধূলো হ'য়ে উড়ে যায়। গোলার সামনে একটা আস্ত সৈন্যদল পড়লে ২০ হাত এগোতে না এগোতে সকলেই নিঃশেষ হয়ে পড়ে।

জলের যুদ্ধেও পরিবর্ত্তনটা বড় কম হয় নি। ডুবো জাহাজের টরপিডোয় ৬৷৷০ কোটী টাকা দামের অতিকায় বর্ম্মধারী যুদ্ধ-জাহাজ ৫ মিনিটের মধ্যে ডুবে যায়। এই এক ডুবো জাহাজের ভয়ে এই যুদ্ধে বড় জাহাজ একেবারেই বেরোতে পারে নি। কিন্তু এ রকম দুএকখানা ডুবো জাহাজ আমাদের দেশের অনেক সৌভাগ্যবান ব্যারিষ্টারই কিনতে পারেন। আর টাটা কোম্পানীও মনে করলে মাসে ৪।৫ ডজন ডুবো জাহাজ তৈরি করতে পারেন।

স্থল, জল, স্থলাভ্যন্তর, জলাভ্যন্তর এই সবকে ছাপিয়ে যুদ্ধ আজ অন্তরীক্ষ পর্য্যন্ত গড়িয়েছে। মানুষ যখন ট্রেঞ্চ থেকে বার হয়ে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত পরস্পরকে খোঁচাখুঁচি করছে, তখন বায়ু-যান তাদের মাথার উপর চিলের মত ছোঁ মেরে নেমে দশ বিশ গজ

উপর থেকে দু চার শ' গুলি মেরে পোঁ করে' উড়ে চলে যায়। শত শত মাইল দূরে থেকেও এই দস্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই। গোলা ও বায়ুযানের বোমার ভয়ে এই চার বৎসর মানুষকে প্রায় ছুঁচোর মত ঘরের নীচে গর্ত্ত করে' দিন কাটাতে হয়েছে। ভবিষ্যের যুদ্ধে যখন এই রকম হাজার কয়েক বায়ুযান একটা দেশের উপর হঠাৎ এক দিন পঙ্গপালের মত এসে আকাশ ছেয়ে ফেলবে তখন মানুষের বোধ হয় আর ইষ্টদেবতার শরণ নেবারও সময় থাকবে না—শাঁক ঘণ্টা বাজান ত দূরের কথা! হাজার গোলা মারলেও একটা বায়ুযানকে ছোঁয়া যায় না, লক্ষ মেসিন গানের বুলেটের একটাও কখনো ভুলেও তাদের গায়ে লাগে না।—পৃথিবীতে এমন একদিন ছিল যখন পাখীদের জ্বালায় স্থলচর মহাকায় জন্তুরও মাটীর ভিতর থেকে মুখ বাড়ান শক্ত হত। ছোট ছোট বায়ুযানের বহুল প্রচলনে মানুষকে কতকটা সেই আদিম অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। অতিকায় বায়ুযান, কামান বা যুদ্ধ জাহাজকে ভবিষ্যের মানুষের ভয় করবার কিছুই নেই। ছোট ছুটকা সাবমেরিণ—ইলিশ মাছের নৌকার মত—এবং তার অর্দ্ধেক লম্বা বাচ্ছা বাচ্ছা মেশিনগান-ধারী বায়ুযানের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় মানুষকে আজ উদ্ভাবন করতে হবে। এখন থেকেই সকল সভ্য দেশের মাটীর নীচে ঘর করতে সুরু করলে মন্দ হয় না! রাস্তাঘাটগুলো এখন থেকেই যারা মাটীর নীচে তৈরি করতে আরম্ভ করবে, তারাই জয়ী হবে ভবিষ্যের যুদ্ধে! অতএব মানুষের আজ থেকে অন্ততঃ দিনে বার ঘণ্টা মাটী ও পাথর কোপাতে অভ্যাস করে' রাখা অত্যাবশ্যক! ভবিষ্যের ডাঙ্গার সৈন্য হবে পাকা একজন চাষা!

সেকেলে লড়ায়ের typeটা একেবারেই আর দেখতে পাওয়া

যায় না। রামচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে কুরুক্ষেত্র, আলেকজান্দার, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, কনিষ্ক, বিক্রমাদিত্য, আকবর, প্রতাপাদিত্য, ঔরঙ্গজেব, হানিবল, সিজার, নেপোলিয়ন পর্য্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল বেশীটা নির্ভর করত সেনাপতির উপর। তার বুদ্ধি আর কায়দাতেই বাজী মাৎ হ'ত। সেনাপতি তখন যুদ্ধক্ষেত্রটা সমস্তই দেখতে পেত, হাতীর উপর বসে কিম্বা টিলার উপর দাঁড়িয়ে প্রতি পদক্ষেপটী নির্দ্দিষ্ট করত, সর্ব্বত্র সকলেই তার আজ্ঞা বা সঙ্কেত পেয়ে কাজ করত। William the Conquerer যখন Hastings'এ ইংরেজদের লেজেগোবরে করেছিলেন তখন নাকি তিনি এমন হাঁক ডাক ছেড়েছিলেন যে ফরাসী সৈন্যরা ভেবেছিল শব্দের সঙ্গে তাঁর বিরাট বপু বুঝি পর্ব্বতের মত হয়ে তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই পালাবার পথ না পেয়ে তারা এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এই রকমে তিনি প্রত্যেক লোককে হেসটিংসে উৎসাহিত করেছিলেন। অবশ্য তাঁর গলার স্বরটা একটু অধিক কর্কশ ছিল। এক মাইল দূর থেকেও তিনি কথা বল্লে নাকি মানুষ শুন্‌তে পেত।

সেকেলে একটা যুদ্ধক্ষেত্র একজন চিত্রকর একটা ১॥০ হাত স্কোয়ার চটের উপর এঁকে দিতে পারত। ঐ ওখানে আমবাগানে ক্লাইভের গোটাকত টুপী আর পাগড়ী কিলবিল করছে, ডাইনে বাঁয়ে কামান থেকে ছোট ছোট লোহার ভ্যাঁটা এসে গুপ্‌ গাপ্‌ করে' কাদায় পড়ে পুঁতে যাচ্ছে—পেছনে খানকতক গাড়ী আর তাঁবুর চট; তার পেছনে একটা মস্ত তালগাছের উপর থেকে ক্লাইভ দুর্ব্বীণ কস্‌ছেন। লাখ লোক খাটিয়ায় শুয়ে তাঁবুর তলা থেকে উঁকি ঝুঁকি মারছে। হাতে তাদের বড় বড় লাঠি, ঢাল, তলোয়ার। বন্দুক কামানও কম

নয়। বারুদের গাদা জলে ধুয়ে ধানের ক্ষেত পানে সার হতে চলেছে—মাত্র দুজন বাঙালী ও একজন ফরাসী কিছু বাঙ্গালী লোক নিয়ে কয়েক শত গজ দূর থেকে গোলাগুলি চালাচ্ছে,—আর তাদের সেনাপতি ভাল ভাল নর্ত্তকী নিয়ে তখন দিভানে বসে গুলি খাচ্ছেন!

কিন্তু আজ যদি কেউ হঠাৎ একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে গিয়ে পড়ে, যেখানে লক্ষ লক্ষ সৈন্য দিবারাত্র যুদ্ধনিরত—সে বোধ হয় সেখানে একটা মানুষ কিম্বা একটা কামানও দেখতে পাবে না। সৈন্য, রসদ, গাড়ী, কামান, বায়ুযান, ঘোড়া. গাধা, বাড়ী, খাত, প্রাকার সকলই আজ মাটীর নীচে অথবা ঘাসের জাল দিয়ে ঢাকা। যখন গোলা ঝাঁকে ঝাঁকে হাওয়াকে চড়্ চড় করে' চিরতে না থাকে তখন ফ্রন্টে বসে সত্যই মধ্য আফ্রিকার অথবা মধ্য ভারতের অরণ্যের কথা মনে পড়ে।

কিন্তু যদি এমনিতর হঠাৎ-আসা নতুন-মানুষ তার অবাক-করা ফ্যারকা চোখ দুটোকে ছোট্ট করে' এনে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুদ্ধক্ষেত্রটা কয়েক মাইল ধরে' নিরীক্ষণ করে' বেড়ায়, তাহলে বোধ হয় সে অবশেষে দেখতে পাবে মাঝে মাঝে কয়েকজন মানুষ মাটীর ভেতর থেকে বেরিয়ে উলুর মধ্যে সাঁতার দিয়ে চলেছে, আবার সময় সময় একটু উঁচু হয়ে এক ছুটে লাফিয়ে গিয়ে নতুন একটা গর্ত্তের মধ্যে পড়ছে। কিন্তু যদি সেই নতুন মানুষের খেয়াল চাপে এই শুক্‌নো ডাঙ্গায় সাঁতার দেওয়া যোদ্ধাদের সেনাপতিকে দেখতে, তাহলে তাকে মাথাটি হেঁট করে' হাতে-পায়ে একটী ঘোলগজী সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকতে হবে। সেথায় তিনি দেখবেন চূণো হাওয়ার মাথাধরা গন্ধের ভেতর, তারের জালে জড়িয়ে টেলিফোন-মুখে সেনাপতি বসে আছেন—একটী ক্ষুদ্র ঘরে মুষিক-রাজার মতো। আর বাহির থেকে খবর শুনে

তিনি তার-বেতারে সংবাদ পাঠাচ্ছেন। তাঁর কাজ কেবল খবর করে' রেলে মোটরে সৈন্য রসদ সেইসব জায়গায় জড় করা যেখানটীতে তিনি চান লড়তে, আক্রমণ বা আত্মরক্ষা করতে। তারপর যদি নতুন মানুষের এ সখও চাপে যে এইসব সৈন্যদলের কর্ত্তাকে একবার দর্শন করে' আসতে, তাহলে তাঁকে প্রায় ১৫০ মাইল পথ রুটী আর অশ্বমেধ খেয়ে, পদচারণে অতিক্রম করতে হবে। সেখানে গিয়ে হয়ত তিনি দেখবেন সেই একই রকম তারের জালে ঘেরা একজন মানুষ একটি খোড়ো বা খোলার চালের তলায় বসে পাইপ মুখে ম্যাপ নিয়ে ভূগোল পড়ছেন!

হারা-জেতা-যুদ্ধ (decisive battle) এখন আর নেই। দিনরাত ছোট ছোট যুদ্ধ চলেছে। তাতে লোকও মরছে অসংখ্য কিন্তু হটাহটী বড়ই কম। দশহাজার লোক মেরে একবার আমরা ২০ গজ এগিয়ে পড়েছিলুম। যুদ্ধে সৈন্য-চালনা (manœuvre) বলে' একটা জিনিস আছে তার স্থান বর্ত্তমান যুদ্ধে খুবই কম। এই রকম সৈন্য-চালনা করেই জার্ম্মাণরা আসছিল। কিন্তু যেমনি মার্ণ যুদ্ধের পর ফরাসীরা ট্রেঞ্চ কেটে ফেললে, তখনি তাদের সব কায়দা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল।

স্বধু যে কায়দারই অদল-বদল হয়েছে তা নয়—অনেক নতুন জিনিস দেখেও এই যুদ্ধে মানুষকে আঁৎকে উঠতে হয়েছে। তার প্রথম নম্বর হচ্ছে গ্যাস, দু নম্বর হচ্ছে এরো, তিন নম্বর তরল অগ্নিবৃষ্টি। আমরা যখন সমর বিদ্যালয়ে প্রথম ঢুক্‌লুম তখন আমাদের শেখান হল—বেয়নেট নিয়ে চার্জ্জ করবার সময় ফাঁক ফাঁক হয়ে ছুটতে। কিন্তু যখন (Charleroi) চার্লরোয়াতে জার্ম্মাণরা হাজারে হাজারে কাতারে

কাতারে ফরাসী সঙ্গীন বন্দুকের সাম্‌নে ছুটে এল, তখন ভয়ে কে যে কোন্‌দিকে পালাল তার ঠিক রইল না। কিন্তু তারপর ইসারে (Yser) আর সে মৎলব খাটল না। ফরাসী ও ইংরাজরা এই বিরাট ব্যূহকে চোখ বুঁজে টিক করে' মাটীর বুকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে। ১৫০,০০০ জার্ম্মাণ কয়েক দিনের মধ্যেই ফরাসী-ইংরাজ গোলায় খোঁড়া ইসারের মাটী আপনার অস্থি দিয়ে উর্ব্বর করে' তুল্‌লে।

তবে বিগত যুদ্ধে আঁৎকানিটা কেবল ফরাসীদেরই একচেটে ছিল। কারণ তারা বর্ব্বরতার যুগ গিয়ে সত্য যুগ এসেছে মনে করে' world peace'এর ধ্যানে মগ্ন ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

—*—

যুদ্ধক্ষেত্রের বিস্তৃতি

আজকালকার যুদ্ধে কায়দাটা (tactics) খুব সরল হয়ে এলেও, লোক আর রসদ যোগান ব্যাপারটা বড়ই কঠিন হয়ে উঠেছে। নিম্নের তালিকায় ব্যাটারী, গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট, পদাতি কোম্পানী ও রেজিমেণ্ট, এবং আর্ম্মি কোর'এর সাজানর তালিকা দেওয়া গেল। তাই থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন কোথায় কত মানুষ, প্রধান সেনা নায়ক (C.O.), ঘোড়া, গাড়ী ও কামান দরকার হয়। ফ্রান্সে ১৯টা আর্ম্মি কোর যুদ্ধ আরম্ভের ২০ দিনের মধ্যেই mobilised হয়। তারপর উপনিবেশ হ'তে এবং দেশে অপেক্ষাকৃত বয়স্থ ও অল্পবয়স্ক লোকদের mobilise করে' এর ঢের বেশী সৈন্য সংগৃহীত হয়েছিল। Mobilisationএর সময়কার সাজানর (organisation) তালিকা দেওয়া হল।

১ম তালিকা— FIELD ARTILLERY.

৭৫, মিঃ মিঃ কামান—not mounted

	অফিসার	রসদগাড়ী	ছোটনায়ক ও লোক	ঘোড়া	কামান
১ম ব্যাটারী	৩	২২	১৭০	১৬৫	৯

৭৫ মিঃ মিঃ কামান —mounted

	অফিসার	রসদগাড়ী	ছোটনায়ক ও লোক	ঘোড়া	কামান
২য় ব্যাটারী	৩	২২	১৭৫	২১৫	৯

	অফিসার	রসদগাড়ী	ছোটনায়ক ও লোক	ঘোড়া	কামান
১৫৫ মিঃ মিঃ কামান					
৩য় ব্যাটারী	৪	৩২	২১২	২২১	৯
৪র্থ ব্যাটারী	৪	৩২	২১২	২২১	৯
এই চার ব্যাটারীর জন্য State-Major Staffএ :—					
	৭	৫	১৮	১৯	+

সুতরাং মোট চার ব্যাটারীর এক Field Artillery Regiment'এ থাকে :—

২১	১১৩	৭৮৭	৮৪১	৩৬

এইরূপ ৬৯টা Field Artillery Regiment ফরাসী mobilisable army'র মধ্যে ছিল। তা হ'লে উপরোক্ত সৈন্যদল উপলক্ষে মোট সংখ্যা—

১,৪৪৯	৭,৭৯৭	৫৪,৩০৩	৫৮,০২৯	২,৪৮৪

তা ছাড়া ১১টা পদাতি গোলন্দাজ ও ২টা পাহাড়ী গোলন্দাজ Regimentও ছিল। তাদের মোট সংখ্যা—

১৩০	৭১৫	৫,০৭০	৫,৪৬০	২৬০

অতএব মোট (৬৯+১১+২)=৮২টা আর্টিলারি Regiment'এ ছিল—

১,৫৭৯	৮,৫১২	৫৯,৩৭৩	৬৩,৪৮৯	২,৭৪৪

২য় তালিকা— ARMY CORPS.

একটা আর্ম্মি কোরে থাকে—২ বা ৩ ডিভিসন পদাতিক। সেতু নির্ম্মাতা ১ সেক্‌সন্, Scarch-lighter ১ সেক্‌সন্, ১

ডিভিসন অশ্বারোহী, ১ ডিভিসন গোলন্দাজ, ১ সেক্‌সন্ টেলিগ্রাফিষ্ট, হাসপাতালের লোক, গুদামের লোক, কয়েক কোম্পানী মজুর, ১ কোম্পানী কারখানার লোক ও গাড়ীওলা—

মোট একটা আর্ম্মি কোরে থাকে—

অফিসার	ছোট অফিসার ও লোক	ঘোড়া	গাড়ী	মোটর
১,০৫০	৩৭,৭০০	১২,০০০	২,২০০	১০০
তা হ'লে ১৯টা আর্ম্মি কোরে থাকে—				
১৯,৯৫০	৭১২,৩৩০	২২৮,০০০	৪১,৪০০	১,৯০০

এই বিরাট বাহিনীকে এক জায়গা থেকে আরএক জায়গায় নিয়ে যেতে হলে (একটি ট্রেণে ২৫০ জন লোক ও সরঞ্জাম বোঝাই ধরে)—দরকার ২,৮০০০টা ট্রেণ। প্রতি ২৫ মিনিট অন্তর একটা একটা ট্রেণ ছাড়লে ২৪ ঘণ্টায় ৯৬টা ট্রেণ যায়; সুতরাং ২,৮০০টা ট্রেণ ছাড়তে লাগবে ২৯ দিন। কিন্তু ২০ দিনের মধ্যেই ফরাসী mobilisation শেষ হয়।—বুঝুন চালান দেবার সরঞ্জামটা কত সুন্দর।

৩য় তালিকা— TRANSPORT.

ফরাসীদের মতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ সৈন্যের সংখ্যা ছিল—৯০,০০,০০০ নব্বুই লক্ষ।

এই বাহিনীকে এক জায়গা হতে অপর যায়গায় নিয়ে যেতে হলে—দিনে ১০০টা ট্রেণ ছাড়লে—৩৬ দিন লাগে। কিন্তু জার্ম্মাণী এর তিন ভাগের একভাগ সময়ে তার mobilisation শেষ করতে পারত।

৪র্থ তালিকা— **MUNITION.**

ফরাসী সৈন্যদলে পদাতি গোলন্দাজ ছাড়া * Field Artilery দলে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ছিল ২৪৮৪টী কামান।

এই কামান প্রতি মিনিটে ৩৬টা গোলা ছুঁড়তে পারে। এই কামানের প্রত্যেকটায় যদি গড়-পড়তা প্রতিদিনে ১,০০০ (হাজার) গোলা ছোড়া যায়, তা হলে ২৪,৮৪,০০০ গোলা প্রতিদিন চাই। আর প্রতি গোলা ১০ সের করে' ওজনে ধরলে, প্রতিদিনে ২,৪৮,৪০,০০০ সের বা ২২,০০০ টন গোলার জন্যই কেবল প্রতিদিন ১০০টা ট্রেণ ফ্রন্টে পাঠাতে হয়। এ সব হল—১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দের হিসাব। ১৯১৭তে রসদ গাড়ী কত দরকার হত, তা তখনকার ফরাসী রেলের অবস্থা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। তখন গাড়ীগুলো একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছল।

৫ম তালিকা— **INFANTRY REGIMENT.**

প্রত্যেক পদাতি কোম্পানিতে থাকে ৪জন অফিসার, ১১ জন ছোট অফিসার, ১৭ জন কর্পোরাল ও ২২২ জন সৈনিক। ৪টী কোম্পানীতে এক রেজিমেণ্ট।

পূর্ব্বে এক একজন কাপ্তেনের হাতে এক একটী সৈন্যদল থাকত, আর তাদের উপর একটা সৈন্যদল নিয়ে রাজা বা সেনাপতি থাকতেন। তাঁর, গায়গাটা বুঝে সুঝে ঐ সৈন্যদলগুলোকে সাজানর উপরেই যুদ্ধের হার-জিত বেশী নির্ভর করত। তারপর দরকার হত কাপ্তেনের ব্যূহরচনা কৌশল, বুদ্ধি ও আজ্ঞা করবার শক্তি।

---

* পদাতি গোলন্দাজ—Heavy Artillery.

তারপর প্রতি সৈন্যের পর্য্যন্ত অস্ত্রচালনা ও আত্মরক্ষা করবার শক্তি ও ব্যক্তিগত অনেক নৈপুণ্য দরকার হত। কিন্তু আজকাল একটা মাঠে দাঁড়িয়ে সৈন্য সাজান হয় না। আর একদিনের মধ্যেই মৎলব করা বা তা কাজে লাগান যায় না। হাজার হাজার মাইল থেকে লক্ষ লক্ষ সৈন্য এনে হাজার হাজার মাইল ট্রেঞ্চ কেটে—রসদ ব’য়ে একটা বড় রকমের আক্রমণ করতে অন্ততঃ ৬মাস সময় লাগে। এখনকার যুদ্ধটা ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে না। সমষ্টিগত নৈপুণ্যের বা organisationএর উপরেই এখনকার হারজিত নির্ভর করে। যুদ্ধটা এখন আর ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ নেই, যুদ্ধটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে বেণের যুদ্ধ। বেশ করে’ ভেবে চিন্তে সেজে গুজে, বড়ের পর বড়ে ঠেলে যে যতদিন দর কসাকসি করতে পারে, সেই জেতে। রসদ তৈরী ও যোগানর কাজটাই যখন যুদ্ধের বড় কথা হল, তখন আর এ বেণের যুদ্ধ নয় ত কি বলব? এখন কায়দার মধ্যে আছে এই যে, যে স্থানে আক্রমণ করতে হবে, সেই স্থানে ছমাস বা একবৎসর আগে থেকে টানেল, ট্রেঞ্চ, ঘরদোর সব বানিয়ে, রসদ সংগ্রহ করে’ গর্ত্তে গর্ত্তে বোঝাই করে’ তারপর রেল মোটরে লোকজন এনে একদিন ভোর রাতে, হঠাৎ ভীম বেগে আক্রমণ করা—তারপর শত্রুর লাইনে একটু ঢুকে গিয়ে, (পকেট করে) দ্রুত দুধারে কনুয়ের গুঁতো দেওয়া। এইরূপে রাস্তাটা একটু ফাঁক হলে পেছন হতে শত্রুকে ঘিরে ফেলা। দ্বিতীয় নম্বর কায়দা হচ্ছে এই যে শত্রুকে ভাঁওতা মারবার জন্যে এক সঙ্গে অনেক যায়গায় আক্রমণ করা, যাতে শত্রু না বুঝতে পারে ঠিক কোন্‌খানে আদৎ আক্রমণটা করবে। একে বলে diversion. তৃতীয় নম্বরের

কায়দা যা আত্মরক্ষায় প্রযুক্ত হয়, তা হচ্ছে এই যে আক্রমণ করলে যত পার শত্রুকে মেরে পরের লাইনে পিছিয়ে এসে দাঁড়ান এবং শত্রু এসে পরিত্যক্ত ট্রেঞ্চ বা স্থানে পা দেবা মাত্র তাকে counter attack করে' গলাটী টিপে স্বস্থানে প্রেরণ করা। এই তিন কায়দা ছাড়া যুদ্ধের চতুর্থ কায়দা (tactics) নেই।

তা হলে সত্যই দেখা যাচ্ছে রসদ যোগান কাজটাই হল আজকালকার যুদ্ধের বড় কথা। তাই আজকাল রেল, মোটর, রাস্তার এত দরকার। যার ভাল অনেক রেল লাইন আছে সে এক-তৃতীয়াংশ লোক নিয়েও বলশালী শত্রুকে হারাতে পারে। এইরূপে একই জার্ম্মাণ division দিনে দু' তিন জায়গায় যুদ্ধ করে' ফরাসীদের হারিয়ে দিয়েছে। রুশিয়া যে প্রায়ই অতি সামান্য জার্ম্মাণ সৈন্যের কাছে হেরে যেত, তার প্রধান কারণ তার ভাল রেল-পথ ছিল না। ১০০,০০০ লোক যদি দাঁড়িয়ে থাকে আর তার flankএ যদি হঠাৎ ৩০,০০০ লোক নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়, তা হলে ঐ একশ হাজার লোকে মোড় ফিরে সাজতে সাজতেই তাদের হেরে পালাতে হবে। রেল মোটর কম থাকলে আজ ১০০,০০০ লোক ৩০,০০০ লোকের চাইতেও কমজোর হয়ে পড়ে।

তারপর যুদ্ধ ক্ষেত্রটা অসম্ভব রকম বেড়ে যাওয়াতে আর concentrated battle নেই। এবং concentration নেই বলেই যুদ্ধটা চলে অনেকদিন ধরে এবং তার মীমাংসা হয় কেবল রসদ ফুরোলে অথবা লোকের মনের সহ্য করবার শক্তি নষ্ট হয়ে গেলে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য তত দরকার না হলেও ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত মনের বল আগের চাইতে শতগুণে এখন দরকার হয়ে

পড়েছে। তখন এক একটা অভিযান দু এক বৎসরের বেশী লাগত না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মাত্র ১৮দিন সময় লেগেছিল; কারণ সেখানে খুব concentrated fight চলেছিল। নাদির শা, আহম্মদ শা প্রভৃতির যুদ্ধও বেশীদিন চলেনি। তাই তখনকার লোকে জানত ৬-এ কমাস গেলেই যুদ্ধের যা হয় একটা হয়ে যাবে, পরে বাড়ী ফিরে আবার পুত্রকন্যার মুখ দেখতে পারব। কিন্তু সেই সব লোককে যদি আজ কোটী গোলা ফাটার মধ্যে গর্ত্তে পুরে বলা হয়, "এই চার বৎসর ধরে' তোমার খাওয়া, পরা, শোয়া, পাইখানা যাওয়া সবই এইখানে"— তা হলে বোধ হয় যুদ্ধের চতুর্থ দিনেই তারা পাগল হয়ে যায়। "বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীর বাসী" প্রথম প্রথম আমরা গান করেছিলুম বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে ভাবগতিক দেখে বাড়ীতে চিঠি লেখা পর্য্যন্ত বন্ধ করে' এক রকম লড়ায়ে ভূতই হয়ে গেছলুম।

আক্রমণ ও আত্মরক্ষা—

ট্রেঞ্চ কেটে পর্য্যন্ত আক্রমণ ও আত্মরক্ষা সম্বন্ধে মানুষের পূর্ব্ব ধারণা সব একেবারে উল্টে গেছে। তখনকার যুগে সকলে আক্রমণ-টাকেই ভাল বলত। দুটো লোকে যদি ঝগড়া হয় ত তার মধ্যে যে প্রথমে আঘাত দিতে পারে, তার একটা অকাট্য moral superiority এসে পড়ে। এই moral depressionটাকে অতিক্রম করে' আক্রমণকারীর তারপরকার ঘুষিগুলো আটকাতে আত্ম-রক্ষাকারীর দ্বিগুণ মনের জোর ও শরীরের সহ্যশক্তি দরকার। তার আর দু-একটা ঘুষি আক্রমণকারীকে মারাত্মক জায়গায় লাগাতে না পারলে জয়ের কোন আশাই থাকে না। তাই যদি মারামারি করতেই

হয়, ত আগে মারাই ভাল। অন্ততঃ তা'তে একটা ভালো রকমের ঘুষি লাভ থাকে। দুজনে মারামারির যে নিয়ম, কোটী কোটী লোকের মধ্যে যুদ্ধেরও সেই একই নিয়ম। বরং ব্যক্তির পক্ষে আপন moral depression এবং surpriseটা তাড়ান সহজ হতে পারে, কিন্তু সমষ্টির মন থেকে moral depression ও surprise তাড়ান বড়ই শক্ত, কারণ সমষ্টিগত মন বড় susceptible, impressionable. তাই ফরাসীরা যখন হেরে পালাচ্ছিল, একেবারে বেলজিয়ম থেকে মার্ণ পর্য্যন্ত, তখন তাদের থামানই দায় হয়ে উঠেছিল—এমন কি এই লক্ষ লক্ষ লোকের ভাঙ্গা-মনের contagion, Generalদের পর্য্যন্ত আক্রমণ করেছিল। Marne-এ জেতবার পর তবে আবার ফরাসী সৈন্ত ও Generalদের শিরদাঁড়া খাড়া হল।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে আগে আক্রমণই ভাল। পূর্ব্বের সকল সেনানায়কই আগে আক্রমণ করতেন। রামচন্দ্র, বাবর, Cæsar, Napoleon, Frederic of Hohenzollern, Moltke, সকলেই আক্রমণের পক্ষপাতী ছিলেন। জার্ম্মাণ State-Major আক্রমণ-গোড়া ছিলেন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

১৮৭০ খৃঃ অব্দে জার্ম্মাণরাজ ফ্রেডরিক, ফরাসীরাজ পঞ্চদশ লুইকে লেখেছিলেন—"First blow is half the battle"—একটা ঘুষি প্রথমে ভাল করে' লাগাতে পারলে যুদ্ধের অর্দ্ধেক জিত।

বার্ণহার্ডি লিখেছেন—"সর্ব্বদাই আক্রমণ করবে—সংখ্যা ও শক্তিতে কম হলেও। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা passive defence নিয়েছিল বলেই হেরে গেছল—আর কেবল আক্রমণ করে' করেই ফ্রেডরিক জিতেছিলেন। নেপোলিয়ন যে এত যুদ্ধে জিতেছেন তা, তাঁর কৃতিত্বের

জন্য যতটা না হ'ক, তাঁর শত্রুদের passivityর জন্যে অনেকটা এটা নিশ্চিত। আত্মরক্ষায় counter attack—এ কায়দাটা নেপোলিয়নের সময়ের লোকেরা জান্‌ত না।"

ইংরাজী Officer's Manual পুস্তকে লেখা আছে যে, "Mob ও অসভ্য জাতদের কখনও আক্রমণ করতে দেবে না—একবার আক্রমণ করে' যদি তারা জেতে ত তাদের হুপ এত বেড়ে যাবে যে তাদের দাবিয়ে রাখা বড় শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। Mob, অসভ্য জাতি ও irregularদের—নিজেরা সংখ্যায় অল্প থাকলেও—আগে আক্রমণ করবে।"—এই কায়দাটা যে খুবই খাঁটী তা তার ফল দেখেই বেশ বোঝা যায়।

কিন্তু খাত ও টানেল কেটে অবধি আক্রমণের সুবিধাটা একেবারে মাটী হয়ে গেছে। যদি শত্রু passive না হয়, যদি সে counter-attack করতে জানে, তাহলে ১০ গুণের কম শক্তি নিয়ে আক্রমণ করতে গেলে আপনাকেই হেরে মরতে হবে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে Calais নেবার জন্যে কয়েকঘণ্টার মধ্যে ১৫০,০০০ লোকের জীবন দিয়েও জার্ম্মাণরা একপা'ও এগোতে পারে নি! তবে আক্রমণের moral value এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

যুদ্ধটার ধারা এখন এমন বদলে গেছে যে, যে বয়সের মানুষে তখন সেনানায়ক হত, সে রকম বয়সের ঢের বড় মানুষ এখন সেনা-নায়ক হচ্ছে। নেপোলিয়নের বাচ্ছা বাচ্ছা কাপ্তেনরা তখন বুড়ো বুড়ো কাপ্তেনদের হারিয়ে দিত। এখন বুড়ো না হলে General হবার জো-ই নেই। Leopold of Bavaria, Hindenburg, Mackensen, Below সকলকার বয়স ৭০ বা তদূর্দ্ধ।

Marshal of Haesler এর বয়স ৮০ বৎসর। এঁদের সকলকেই এক রকম যুদ্ধকর্ম্ম থেকে ছুটী দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় এঁদের আবার ডেকে এনে মাথার উপর বসাতে হল। এর কারণ, তখনকার দিনে যুদ্ধে নায়কদের মনের এক রকম গুণের দরকার হত, এখনকার দিনে অন্য রকম গুণের দরকার। Organisation শক্তি, ধীর স্থির বুদ্ধি, moral resistance, বিচক্ষণতা এখন বেশী দরকার, তাই বুড়োদের এত দর এবং এই গুণগুলো বড় ব্যবসাদার ও কলওলাদের থাকে বলে তাদেরও আমরা সৈন্যদলে খুব বড় বড় পদে দেখতে পাই। হেঁপে ঝেঁপে সৈন্য জড় করে', আক্রমণ দিয়ে, গায়ের জোরে অথবা হুমকী দেখিয়ে তিন দিনে যুদ্ধ জিতে নেবার সময় অতীত হয়ে গেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

দূর্গ ও খাত

ইউরোপীয় যুদ্ধের পর দুর্গের আবশ্যকতা সম্বন্ধে লোকে বিশেষ সন্দিহান হয়ে পড়েছে। একমাত্র, যাদের কামান নেই, এমন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে, আত্মরক্ষায়, এখনও দুর্গের সার্থকতা আছে। কিন্তু আক্রমণ করতে হলে চিরকালের মত এখনও দুর্গ অর্থহীন। দুর্গের এই অধঃপতন হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে খাতের আবির্ভাবে। এই অশক্ত-প্রতীয়মান মূল্যহীন মাটীর নর্দ্দমাগুলো—শক্ত, বহুমূল্য, প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টিত দুর্গ সকলকে, একে একে তাদের সকল সুখ্যাতি (prestige) কেড়ে নিয়ে, যুদ্ধক্ষেত্র হতে ঠেলে ঠেলে একেবারে বার করে' দিতে চলেছে।

পৃথিবীতে আজকাল অধিকাংশ দুর্গই ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে অথবা গুদাম, কারাগার ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এই দুর্গ ভাঙ্গার কারণ এ নয় যে, পৃথিবীর লোক আর যুদ্ধ করবে না—এর কারণ, বড় বড় Dreadnought (ড্রেড্‌নট্‌) ও Zeplin (জেপ্লিন্‌)-এর মত দুর্গের এখন আর কোন আবশ্যকতা নেই, কিন্তু Aeroplane (এরোপ্লেন), Submarine (সাবমেরিণ) এবং long range gun (বড় বড় কামান)-এর বিশেষ দরকার আছে বলে' সেগুলো কমাতে সকলেই অল্পবিস্তর গররাজী।

এখনও যে দেশে দেশে দু একটা ফোর্ট খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা ঐ মানব হৃদয়ের সনাতন মায়া-প্রবৃত্তি থাকার জন্যে—অথবা বুনো কিম্বা বাঁদর আফ্রিকা ও এশিয়াবাসীকে ভড়ং-এ ভুলিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে। খাতের সঙ্গে শক্তি-প্রতিযোগিতায় দুর্গ একেবারে হেরে গেছে। কারণ দুর্গে যে সকল সুবিধা খাতে তা'ত আছেই, তাছাড়া খাতে এমন অনেক সুবিধা আছে যা অচল ও ব্যয়বহুল দুর্গের মধ্যে অসম্ভব। এখন তাই লোকে ভবিষ্যের যুদ্ধের জন্যে বহু অর্থ ও সময় ব্যয়ে বিরাটবপু দুর্গ নির্ম্মাণ না করে', লম্বা লম্বা হাল্কা কামানের ব্যবস্থা করেছে এবং তরোয়াল বন্দুকের বদলে কোদাল গাঁতি, কিছু কিছু সালফিউরিক, নাইট্রিক ও কার্ব্বলিক এ্যাসিড প্রভৃতি রসায়ন, গ্যাস তাড়াবার জন্যে কিছু এমোনিয়া, বারুদের জন্য তুলা, কলেরা ও ইনফ্লুয়েঞ্জার বীজাণু এবং বায়ুযানের জন্য কিছু কিছু পেট্রল ও এ্যালুমিনিয়মের চাদর, অথবা অভাবে করগেট টিন কিনে গুদাম-জাত করেছে।

কিন্তু খাতটা যে হঠাৎ ভুঁইফোঁড় হয়ে একেবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে দাঁড়াবে তা লোকে একেবারেই জান্‌ত না। লোকে কখনও ভাবতে পারে নি যে অনতিক্রম্য 'নামুর', 'এন্‌ভার', ও 'লিজের' দুর্গ কয়েক দিনের মধ্যেই একটা লোকক্ষয় পর্য্যন্ত না করে' শত্রু কেড়ে নিতে পারবে এবং অরক্ষিত "নান্‌সি" সহর দুচার লাইন ট্রেঞ্চ কাটার জন্যে সত্যই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠ্‌বে। যুদ্ধের পূর্ব্বে কোন জাতেরই দৃষ্টির দিগন্ত জালের মধ্যে এই ঘটনাটা ধরা পড়েনি।

এই যুদ্ধের পর থেকে দুর্গের আবশ্যকতা একেবারেই শেষ হল। কারণ পৃথিবীর বড় বড় দুর্গের মধ্যে একটাও দশ পোনেরো দিনও

শত্রুকে বাধা দিতে পারলে না। Charlemontএর (চার্লমঁ) বিশাল দুর্গ ২৯এ আগষ্ট আক্রান্ত হল, এবং তিন-তিন দিনের মধ্যে ৭ মাইল দূর থেকে জার্ম্মাণরা সেটা ভূমিস্যাৎ করে' দিলে—এবং এই যুদ্ধে ফরাসীদের একটা গোলাও তাদের প্রথম লাইনে গিয়ে পড়ল না। 'লংভী' দুর্গটা ১৫ দিনও টিঁকল না।

জার্ম্মাণরা অবশ্য সকল জিনিষের মত তাদের কামানগুলো যে এতদূর গোলা চালাতে পারে সে কথাটা গোপন রেখেছিল—এটা খুবই স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু যখন দূর থেকে দাঁড়িয়ে তারা ভীম গোলা বর্ষণে পর্ব্বত প্রাকার সব ধোঁয়া করে' উড়িয়ে দিচ্ছিল, এবং প্রতিপক্ষের গোলাগুলো মাঝ রাস্তায় এসেই শক্তিহীন হয়ে ধুপ্ ধাপ্ পড়ছে দেখছিল, তখন যে তারা কি হাসিটাই হেসেছিল তা সহজেই অনুমাণ করে' নেওয়া যেতে পারে।

এখন দুর্গ ও খাতের কথা আলোচনা ও তুলনা করে' বোঝা যাচ্ছে যে দুর্গের রক্ষা করবার শক্তি, সবই আজ কল্পনামাত্র। দুর্গে সৈন্য ও কামান বন্ধ করে' রেখে কেবল আপনাকে শক্তিহীন করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। কারণ দুর্গ থেকে ছাড়া পেলে সেইসব সৈন্য সহজেই, খাতকেটে চলেফিরে লড়তে পারে। এটা অতি সহজ কথা যে একজন স্থূলকায় পালোয়ানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মকায় অথচ ত্বরিতগতি একটা গুণ্ডার সামর্থ্য বেশী। ঠিক এই জন্যেই গরুর চাইতে নেকড়ে বাঘ বলশালী, মানুষের চাইতে হনুমান, হাতীর চাইতে বাঘ, Dreadnought (ড্রেড্নট্)-এর চাইতে সাবমেরিণ এবং জেপ্লিনের চাইতে Monoplane (মনোপ্লেন্) অধিকতর মারাত্মক। এবং ঠিক এই কারণেই খাত দুর্গ অপেক্ষা শক্ত। খাতটা

একটা সচল দুর্গ। যুদ্ধক্ষেত্রে, সমতল ভূমিতে, পাহাড়ের উপরে সর্ব্বত্রই অল্প সময়ে ও অনায়াসে, কেবলমাত্র কোদাল ও গাঁতি দিয়ে এগুলো খোঁড়া যায়। একটা খাত শত্রু কেড়ে নিলে, কি গোলার আঘাতে ভেঙ্গে গেলে তৎক্ষণাৎ আর একটা খাত তার পেছনে কেটে ফেলা যায়। সেগুলোকে যেদিকে ইচ্ছে ফেরান যায়, ঘোরান যায়—এতে অর্থব্যয় নেই বল্লেই হয়। অতি অল্পলোকেই এটা রক্ষা করতে পারে, কিন্তু অল্প লোক হলেও এটার বাধা দেবার শক্তি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ভাল দুর্গের চাইতেও বেশী। তাই এই খাতের প্রচলনে আক্রমণের চাইতে আত্মরক্ষা সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা ছোট সৈন্যদল যদি খাতের মধ্যে আশ্রয় নেয় ত তার দশ গুণ সৈন্য ও কামান না হলে তাকে জোর করে' হঠান অসম্ভব। খাত খুঁড়ে সব চাইতে যুদ্ধে মুস্কিল হয়েছে এই যে, দশগুণ লোক ও গোলা ক্ষয় করে' অমানুষিক চেষ্টার পর যখন শত্রু একটা লাইন খাত দখল করে, তখন সেই সময়ের মধ্যে, লোকে হাস্‌তে হাস্‌তে তার পিছনে পিছনে তিনটা লাইন খাত খুঁড়ে ফেলে—এবং বিজয়ী বাহিনীকে আবার শ্রীশ্রীদুর্গা হ'তে আরম্ভ করতে হয়। অর্থাৎ ব্যাপারটা চির-কালই 'যৎপূর্ব্বং তৎ পরং' হয়ে থাকে। ইচ্ছা করে' না হারলে অর্থাৎ ইচ্ছাটা (will) ভেঙ্গে না গেলে—জোর করে' খাতের ভেতর হারানো বড় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই যুদ্ধে তলোয়ার বন্দুকের কায়দা অথবা সেনাপতির মৎলব গিয়ে এখন দাঁড়িয়েছে একটা রেল-মটর প্রতিযোগিতায়, কলকারখানার mechanicsএ, এবং কোটী কোটী লোকের তিন বেলা ভুরিভোজনের ব্যবস্থায় আর কে কতদিন ধৈর্য্য ধরে' গর্ত্তে বসে থাকৃতে পারে—এই হচ্ছে লড়াই—অর্থাৎ patience competition. এখন

যুদ্ধের হারজিত একটা স্বাভাবিক ও সার্ব্বজনীন মুমূর্ষু অবস্থা (exhaustion) না এলে হয় না। ঠিক এই রকম exhaustionএর ভেতর দিয়েই জার্ম্মাণী হেরেছে—পরন্তু যুদ্ধে নয়।

যুদ্ধে খাতের এত বাড়বাড়ন্ত একেবারেই নতুন। কিন্তু খাত যে কেউ কখনো দেখেনি অথবা যুদ্ধে খাতের এই প্রথম প্রচলন তা নয়, তবে এত বেশী করে' খাত কখনো কোনো যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় নি—খাত রক্ষা করবার জন্যে এত যন্ত্রতন্ত্রেরও কখনো আবিষ্কার হয় নি। খাত পূর্ব্বে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয়ে গেছে। ১৬৪০ খৃঃ অব্দে 'আরাস্' অবরোধে, ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে 'ডান্কারর্ক' অবরোধে, ওয়াটারলু যুদ্ধে, ট্রান্সভাল যুদ্ধে, এমন কি সেদিনের রুষ-জাপান যুদ্ধেও খাতের ব্যবহার হয়েছিল। সুধু তাই নয় অতি পূর্ব্বকালেও আমাদের দেশে খাতের প্রচলন ছিল। রামায়ণের যুগে খাত ও টানেল বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত!—এরও পূর্ব্বকালে যে পৃথিবীতে খাতের প্রচলন ছিল তা'তে আশ্চর্য্যের কোন কথা নেই। বরং সেইটাই স্বাভাবিক। বনের মানুষ, অসভ্য মানুষ, প্রথম বনজঙ্গল, পাহাড়ের আড়াল, নালা গর্ত্তের অন্তরাল থেকেই যুদ্ধ করত। আদিম মানুষ খাতের আবশ্যকতা যে খুব বেশী বুঝত তাতে আর সন্দেহ নেই। সে আজ অনেক যুগের কথা। তারপর আদিম অবস্থা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন মানুষ সমাজে রাজা হ'ল, রাজধানী হ'ল, রাজবাটী হ'ল, তখন রাজবাটীকে মাঝে করে' তার চারধারে নির্ম্মিত হ'ল দুর্গ। অর্থাৎ সচল স্বাভাবিক বনের বিস্তৃত খাত পাহাড় কেন্দ্রীভূত হয়ে রাজনিবাসে সৃষ্টি করলে এক অচল, ব্যয়বহুল, প্রকাণ্ড দুর্গ। এই দুর্গের চতুর্দ্দিকেই চিরকাল যুদ্ধ হয়ে আসছিল—কারণ রাজাকে মারা ও রাজধানী দখল করা ছিল

চিরদিন সকল যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষ্য। আর যুদ্ধটাও চিরদিন হ'ত কেবল রাজায় রাজায়, নিজেদের স্বার্থ নিয়ে। তাই দুর্গ সেই কোন্ আদিমযুগের পর থেকে এতদিন মানব-সমাজে চলে' আস্‌ছে।

কিন্তু আবার সেই আদিম খাত মানব-সমাজে নতুন করে' আবির্ভূত হয়েছে। সুধু যে খাতই বিস্মৃতির কবর থেকে উঠে এসেছে তা নয়, পুরাতনের অনেক কিছুই বিগত যুদ্ধে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে। সেই কোন্ কালে (kinghtদের যুগে) ক্ষত্রিয়তার যুগে, মানুষ বর্ম্মের সঙ্গে লৌহ শিরস্ত্রাণ পরত—সেই লৌহ শিরস্ত্রাণ, Sharp-nell (সার্পনেল্) থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে হঠাৎ আবার মৃত্যুর জগৎ থেকে উঠে এসে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে Steel helmet রূপে কোটী কোটী নরনারীর শিরভূষণ হয়ে দেখা দিলে। আবার সেই কোন্‌কালে মানুষ উঁচু উঁচু কাঁটা গাছ ও বাঁশের বেড়া দিয়ে নিজের গ্রাম রক্ষা করত, (এখনও Cochin Chinaতে গ্রামের চারপাশে এমনিতর বেড়া দেখা যায়)—এখনও আমাদের পুজা ও যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের বেদীর চারদিকে কঞ্চি আর সুতোর জীর্ণ ব্যবধান—পৌরাণিক যুগের ঋষিদের যজ্ঞভূমি, যার চারিদিকে ক্ষত্রিয় রাজারা সেনা সন্নিবেশ করে' এইরূপ বেড়া দিয়ে পাহারা দিতেন—তার নিদর্শন বুকে করে' বেঁচে আছে; সেই বড় বড় কাঁটা-বেড়া দিয়ে শত্রু আটক করবার প্রথাটাও শত শতাব্দীর বিস্মৃতি ভেদ করে' সেদিন ইউরোপীয় রণাঙ্গনে দেখা দিয়েছিল। সুধু তাই নয়, লুকিয়ে থেকে যুদ্ধ করা, গাছপালা চাপা দিয়ে লুকিয়ে থাকা, খোলা মাঠে যুদ্ধ একেবারে পরিত্যাগ করা—আদিম মানুষের যুদ্ধরীতির যা সব প্রধান অঙ্গ ছিল—সেই লুকান (Camouflage) আজ যে কোথায় দরকার নেই, কোথায় ব্যবহৃত

হয়নি তার ঠিক নেই। রাস্তা, ঘাট কামান, সৈন্য, গুদাম, বাড়ী, Hangar সব কিছুই ঘাসের জাল ও কাঁচা লতাপাতা দিয়ে ঢাকা, আজ যুদ্ধের একটা প্রধান কাজ। ঐ জিনিষপত্র ঢাকবার জন্যেই যে কত কোটী সবুজ রংকরা ঘাসের পাল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদিন আমদানি হ'ত তার ইয়ত্তা নেই। তারপর শেষ অভ্যুদয় tank বা যুদ্ধরথ।

এই সব দেখে সত্যই মনে হয় যে বিগত কুরুক্ষেত্রে পৃথিবীর যাবতীয় ভাব ও আদর্শ (অতীত ও বর্ত্তমান) সবই যেমন শেষ একটা জীবন-মরণ যুদ্ধ করতে মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, সেই রকম লড়ায়ের সব অতীত ও বর্ত্তমান উপকরণগুলোও বুঝি একবার শেষ সার্থকতা পাবার জন্যে বিস্মৃতির অতল তল থেকে উঠে এসেছিল। বড় বড় যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রকৃতি এই রকম মাঝে মাঝে স্মৃতি থেকে অতীতের আদর্শ ও উপকরণের একটা recapitulation করে' থাকে। এইরূপেই খাত, helmet, যুদ্ধরথ, কাঁটা-তারের বেড়া ও camouflage আবার আমরা নতুন করে' দেখতে পেয়েছি এবং এই recapitulation-এর পর যে প্রকৃতি এগুলোকে ফেলে দেবে, এরূপ প্রমাণ অন্তর ও বাহির কোন দিক থেকেই পাওয়া যায় না। এগুলো বোধ হয় পৃথিবীতে কিছুদিন থাকতেই এসেছে।

প্রকৃতির এ রকম recapitulation একটা খেয়াল নয়। এটা তারই গড়া একটা আইন। কারণ প্রকৃতিতে কোন কিছুই একেবারে নতুন সৃষ্টি হয় না—অন্ততঃ হচ্ছে বলে' আমরা জানি না। কি জীবন, কি শক্তি, কি পদার্থ কিছুই নয়। প্রকৃতি কেবল করছে অদল-বদল, পরিবর্ত্তন, ক্রম-বিবর্ত্তন। তাই যখন তথাকথিত নতুন একটা কিছু তৈরী করবার দরকার পড়ে তখন প্রকৃতি তার ভাঁড়ারের মাল-মসলাগুলো

সব একবার নেড়ে চেড়ে দেখে নেয়—তারপর তাই থেকে ভেঙ্গেচুরে জোড়াতাড়া দিয়ে একটু মেজে-ঘষে কত কি বিচিত্রই না সে সৃষ্টি করছে। এমন কি বড় একটা কিছুর জন্ম দেবার সময় সে গোড়ার অবস্থা থেকে আরম্ভ করে' তাড়াতাড়ি বদলে বদলে শেষে যা করবে তার জন্ম দেয়। মানুষ পিতার দেহে জীবন-বীজাণু হয়ে থাকে। সেই বীজাণু মাতৃ-উদরে সরিসৃপরূপে প্রবেশ করে। তারপর রূপান্তরিত হয়ে মাছের মত কানকো পটপটি দিয়ে বেঁচে থাকে। তারপর তার জন্তুর মত হাত পা গজায়, শেষে সে মানুষ হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। বছর তিন পর্য্যন্ত তার আচার ব্যবহার ভাব ও emotion সবই থাকে জন্তুর মত।—হরিণের শিং গড়বার সময়ও প্রকৃতি ঠিক এমনি করেই অগ্রসর হয়। হরিণের পূর্ব্বপুরুষদের ছিল মাত্র গরুর মত দুটো শিং। তারপর যুগে যুগে যে সব হরিণ পৃথিবীতে বাস করেছে তাদের দু' একটা করে' শিং-এ ফেক্ড়া বেরিয়েছে। হরিণের যে-সব হাড় মাটীর নীচে পাওয়া গেছে তাই থেকেই এই তথ্য অবগত হওয়া যায়। কিন্তু মজা এই যে আজকালকার শিঙ্গাল হরিণ ঠিক এই রকম পরপর শিং ফেলে ৬ষ্ঠ বৎসর বয়সে তার বর্ত্তমান শৃঙ্গের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রথম বৎসর হরিণদের গজায় দুটো শিং—সেই প্রাথমিক হরিণদের মত—তারপর দ্বিতীয় বৎসরে গজায় প্রতি শিং-এ চারটে করে' ফ্যাক্ড়া, তৃতীয় বৎসরে আরও একটা করে' বেশী; ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বৎসরেও ঠিক এই ক্রমেই তাদের শিং বাড়ে। এই ছয় বৎসর শিংএর বাড়ার মধ্যে, হরিণ জীবনের কোটী বৎসরের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে' নেয় যে প্রকৃতি, তার মাথা থেকে সেদিনকারের আদিম মানুষের যুদ্ধের উপকরণ—খাত, helmet,

wire entanglement, camouflage, যুদ্ধরথ—মুছে যাবে কেমন করে' ?

জীবনের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি একেবারে একটা অবান্তর কথা ধরা যায়, সেখানেও ঐ recapitulation, readjustment; কিন্তু নবসৃষ্টি কোথাও নেই। একজন প্যারিসের সম্ভ্রান্ত মহিলার পরিচ্ছদ যদি সৌভাগ্যক্রমে কারো দৃষ্টির মধ্যে আসে, আর যদি তাঁর পৃথিবীর Fashion'এর ইতিহাস জানা থাকে, তাহলে তিনি দেখবেন যে ভদ্রমহিলার পরিচ্ছদ, পৃথিবীর সর্ব্বযুগের পরিচ্ছদের একটা *resumé*, বা sum-up মাত্র।

প্রথমেই তিনি দেখবেন বাঙ্গালী মেয়ের মাথার টিপ ভদ্র মহিলার গালের উপর গিয়ে বসেছে। তারপর দেখবেন হাতের নখের ডগায় তাঁর আলতা পরা, চোখের কোলে কাজল, বুকের উপর তাঁর মণিপুরী স্তন-বন্ধনী, গায়ে Roumania'র bodice, মাথায় আমেরিকান military felt hat, চুলে জাপানী খোঁপা, হাতে চীনা পাখা; আরও কত যুগের কত কি, তা সব কথা বলা যায় না। যারা প্যারিসের বড় বড় 'modist', তারা প্রতি ঋতুতে পৃথিবীর সব পরিচ্ছদগুলো একবার নাড়াচাড়া করে' দেখে, তারপর তাদের 'modist intuition' দিয়ে একটা যা হক কিছু খাড়া করে' তোলে—সেইটাই তখন সারা জগতের সেই ঋতুর পোষাক হয়ে দাঁড়ায়। কখনও যে তারা নতুন কোন পোষাক সৃষ্টি করে না, এটা সত্য। কিন্তু তারা এমন সুন্দর করে' একটু-আধটু বদলে জিনিষগুলো জোড়া দেয়, যে সবটা সত্যই একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ বলে বোধ হয়! ঠিক এমনি করে' এমন একটি জায়গায়, পূর্ব্বের এমন কতকগুলি জিনিষ বিগত যুদ্ধে ঢুকেছে যে,

একেবারে নতুন না হলেও, সেটা সত্যই যুদ্ধটাকে একটা নতুন রূপ দিয়েছে। ফ্রান্সের যুদ্ধ-সাহিত্যে অনেক দিন ধরেই খাত, wire entanglement, camouflageএর কথা লেখা ছিল—জার্ম্মাণ যুদ্ধ বয়েতেও ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের মাথা থেকে এসব পুরাতন জিনিষের, নবরূপে নবভাবে প্রয়োগ কিরূপে হ'তে পারে, তার visionটা বার হয় নি। কিন্তু জার্ম্মাণদের কল্পনাশক্তি ছিল। তারা পরিত্যক্ত খাত ও তারের বেড়াকে সামনে এনে এমন নতুন করে' ব্যবহার করলে যে, পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি একত্রিত হয়েও তাদের ৪ বৎসরে একপা'ও হটাতে পারলে না—যতক্ষণ না খাবার ও রসদ অভাবে তারা হার মান্‌তে বাধ্য হ'ল।

খাতের গঠন ও লড়াই

আধুনিক যুদ্ধে কামানধারী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে দুর্গের অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে পাঠকের বোধ হয় একটু বস্তুতন্ত্র ধারণা হয়েছে। আর বোধ হয় এটাও বুঝতে পেরেছেন যে দুর্গের বদলে খাতের বাড়বাড়ন্ত এখন সব জায়গায়ই এসে পড়েছে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে, অর্থাৎ খাতের সুবিধা সম্বন্ধেও, বোধ হয় কিছু কিছু ধারণা জন্মেছে। এখন খাতের গঠন প্রণালী ও খাতের যুদ্ধ, এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

যদি কল্‌কাতা থেকে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত এক-মানুষ-ভোর ও এক গজ চওড়া একটা লম্বা নদ্দমা কাটা যায়, সেটা হ'ল বর্ত্তমান যুদ্ধের একটা লাইন খাত। এর চাইতে যে ছোট খাত হ'তে পারে না তা নয়। তা'ও পারে এবং এর চাইতে বড়ও হ'তে পারে। অর্থাৎ

যে দেশ বা দেশপুঞ্জের সঙ্গে অপর এক দেশ বা দেশপুঞ্জের যুদ্ধ চলেছে, এই দুই দেশের মধ্যের সীমাটা যত লম্বা বা খাট হ'ক না, তার ধারে ধারে এইরূপ লম্বা খাত কাটতে হবে। যদি একদিন উত্তরাপথে, "মাথায় পাগড়ী" মানুষের সঙ্গে "খালি মাথা" মানুষের যুদ্ধ বাধে, তাহ'লে বাঙ্গালীদের সেই দার্জ্জিলিং থেকে আরম্ভ করে' জলপাইগুড়ির পশ্চিম দিয়ে, দিনাজপুরকে পূর্ব্বে রেখে, মালদহর ধার দিয়ে, মুর্শিদাবাদকে স্পর্শ করে', বীরভূমের পশ্চিম সীমা দিয়ে, বর্দ্ধমানকে মাত্র ছুঁয়ে, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের বাঁ দিক দিয়ে, কাঁথিকে ডাইনে রেখে সাগর পর্য্যন্ত এক লাইন খাত কাটতে হবে। এই দীর্ঘ লাইন খাতটা যে একটা সরল রেখায় হবে না, তা সহজেই বোঝা যায়, কারণ বাঙ্গালা দেশের পশ্চিম সীমাটা একটা সরল রেখায় নেই। তা' ছাড়া এই লম্বা মানুষ-ভোর খাত খুঁড়তে মাঝে কত পাহাড় নদী জলা বিল মাঠ বন পড়বে, তার ঠিকানা নেই। এইজন্য খাতটাও একটু-আধটু বাঁকাচোরা, মাঝে-মাঝে একটু-আধটু ফাঁক হবেই—এটা অবশ্যম্ভাবী। এখন আমাদের ভাবতে হবে, এই রকম বাঁকাচোরাতে লাভ না ক্ষতি?—এতে সম্পূর্ণ লাভ, ক্ষতি কিছুমাত্র নেই। তাহ'লে লাইনটা যদি আরও বেশী এঁকে বেঁকে যায়—লাভ কি আরও বেশী হতে পারে? হাঁ, লাইন যত বাঁকবে চুরবে ততই লাভ। তা হলে যদি প্রতি বিশ পঞ্চাশ হাত অন্তর ইচ্ছা করে' খাত-রেখাটীকে বাঁকিয়ে মুচড়ে দেওয়া যায় তাহলে বোধ হয় লাভের সীমা থাকে না? হাঁ এইটেই ঠিক—এইজন্য খাত কাটবার নিয়মই এই যে প্রতি ২০।৩০ গজ অন্তর অন্ততঃ একটা মোড় থাকা চাই, এবং প্রতি ১০।২০ হাত অন্তর খাত-টাকে মোড় ফেরান শক্ত হ'লে ঐ ব্যবধানে খাতের পরিসরের আধখানা

২ গজ মোটা মাটীর দেওয়াল দিয়ে আড়াল দিতে হয়। এই রকমে তৈরী একটা খাতে যদি গোলা এসে পড়ে, তাহ'লে ঐ ব্যবধানে অর্থাৎ দশ হাতের মধ্যে, যারা থাকে তারাই অল্পবিস্তর হতাহত হয়, কিন্তু ঐ পাঁচিল বা মোড়ের এধারে-ওধারে যারা থাকে তাদের কিছুই হয় না। এইরূপে এক এক লাইন খাত কাটতে হয়। খাতগুলো প্রায় ২ গজ গভীর এবং ১ হতে ১॥০ গজ চওড়া। পাঁচিলগুলো ২ হতে ৩ গজ মোটা এবং মাথা পর্য্যন্ত উঁচু—পাঁচিলের কাছ দিয়ে মাত্র একজন লোক খাতের এধার-ওধার যেতে পারে নতুবা অন্যত্র সাম্‌না-সাম্‌নি দুজন লোকও যেতে পারে। *

এই রকম তিন লাইন খাত পিছু পিছু ২০ হতে ৫০ গজ পর্য্যন্ত ব্যবধানে থাকে—তাই নিয়ে হয় প্রথম খাতপুঞ্জ (First system of trenches)। এই তিন লাইনের মধ্যে যাতায়াত করবার জন্য সংযোজক-খাত আছে। এই সংযোজকগুলি, সাধারণতঃ, উপরে ১০ আঙুল মোটা লকড়ি বা ঐ ব্যাসের ডালপালার বোঝা ও তার উপরে ১০ আঙুল মাটি দিয়ে ঢাকা। যখন এক লাইন পরিত্যাগ করে'

---

* উপরের মাপ, খাতের ভেতর পড়া গোলা ফোটার টুকরো আটকাবার জন্যে। কিন্তু গোলা ঠিক খাতে পড়ে না। বিস্তৃত ও উঁচু দুর্গ সহজেই গোলা দিয়ে ছোঁয়া যায় কিন্তু সরু ও নীচু খাতে গোলা মারা দুঃসাধ্য। যাক সে কথা। কিন্তু যদি কখন সাময়িক ভাবে আস্ত গোলাকে সামনে থেকে রুখতে হয় তাহলে নিম্নের মাপে মাটির একটা শক্ত Rampart (বাঁধ) করতে হবে।

Field Artilleryর গোলার বিরুদ্ধে—শক্ত মাটীর বাঁধ—মাথা			২৷৩	গজ চওড়া
Light Heavy Gunএর	"	"	৪৷৫	"
Heavy Gunএর	"	"	৬৷৭	"

অপর লাইনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হয় তখন শত্রুরা এরোপ্লেন বা অবজার্ভেটরী থেকে দেখে, কোন্ পথে লোক পালাচ্ছে। সেই পথটা আটকালেই প্রথম খাতের সব লোক ধরা পড়ে যায়। তাই এই গমনাগমন-প্রণালীগুলোর অর্থাৎ সংযোজক খাতের উপরটা চাপা দেওয়া। এইরূপ বহু খাতপুঞ্জ (trench-systems) পিছু পিছু দুই-এক মাইল ব্যবধানে থাকে।

এই সব খাতের দেওয়ালের গায়ে টেলিফোনের তার এবং মাঝে মাঝে দিক ও স্থান নির্ণয়াত্মক বিজ্ঞাপন থাকে ; এই তার দিয়ে খাতে খাতে এবং সেনাপতির সঙ্গে খবরাখবর চলে, আজ্ঞা আসে ও সংবাদ যায়—এবং এই বিজ্ঞাপন দেখে লোকে রাস্তা ঠিক করে, কারণ খাতের ভেতরটা সব একরকম, সহসা ধাঁধা লেগে যায়। তারপর দেওয়ালে মাঝে মাঝে ৫০।৬০ হাত অন্তর ছোট ছোট ঘুলঘুলী আছে, সেখানে বোমা জড় করা থাকে। যুদ্ধের সময় শস্ত্রের জন্য আর ভাবতে হয় না। খাত ও সংযোজকগুলিতে মাঝে মাঝে বড় বড় সুড়ঙ্গ করা হয়, পাথুরে মাটীতে ১২।১৩ হাত গভীর। প্রতি লাইন খাতে ৫০।১০০ গজ অন্তর খাতের পাঁচিলে গর্ত্ত করে' ৪ × ৩ গজ ঘর থাকে। এই সুড়ঙ্গ ও ভূগর্ভস্থ ঘরে, ভীষণ গোলা বর্ষণের সময় লোকে আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রথম খাতপুঞ্জের প্রথম লাইনে, শত্রুর সব চাইতে নিকটস্থ বিন্দুতে, পদাতিদের দুচারজন লোক থাকে, তারা কেবল লক্ষ্য রাখে শত্রু কি করছে। এজন্য নানারূপ যন্ত্র ও উপায় আছে। মাটির মধ্যে চোঙা দিয়ে দেখা ও পেরিস্কোপ দিয়ে দেখা এর মধ্যে প্রধান। সেখানে অবশ্য উঁকি মেরে দেখার কোন উপায় নেই, কারণ এরকম করলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। ঐ স্থানে গোলন্দাজদলেরও দুচারজন লোক থাকে। তাদের কাজ গ্যাস-টিউব

থেকে হাওয়ার সুবিধা পেলেই গ্যাস ছাড়া এবং খাতের টরপিডো ছোঁড়া। এই দুই কাজই অত্যন্ত সাংঘাতিক। কারণ এই কাজে যে ২।৪ ঘণ্টা টিঁকে, তার গুরুবল যে অসাধারণ, তা বলাই বাহুল্য। এই ২।৪ জন ছাড়া গোলন্দাজদের কেউ খাতে থাকে না। তারা প্রথম খাতপুঞ্জের পশ্চাতে সুড়ঙ্গ কেটে অথবা মাটীর নীচে ঘর করে' বাস করে এবং স্বাভাবিক বা কৃত্রিম Rampartএর পেছনে ব্যাটারী বসায়। কলোনেল হতে পদাতিক যত অধস্তন নায়ক ও সৈন্য, সকলেই খাতে বাস করে—অন্ততঃ করা উচিত। জেনারেলরা যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক পেছনে থাকে—সেখানে কামানের আওয়াজ পর্য্যন্ত পৌঁছয় না। এর কারণ ভয় নয়—যে যত বড়, সে তত দূরে না থাক্‌লে সকলকে এক সঙ্গে দেখতে পায় না। কাজের সুবিধের জন্যেই তাঁকে দূরে থাকতে হয়। পরন্তু এক একটা বুড়ো খোঁড়া ফরাসী জেনারেলের চোখের চাউনি দেখলে মনে হয় বীরত্ব বুঝি ঘনীভূত হয়ে মূর্ত্তি নিয়ে এসেছে, তাদের ছোঁয়াচে এলে ভীরুরও সমরস্পৃহা জেগে ওঠে।

এই খাত খুঁড়তে হয় গাঁতি ও কোদাল দিয়ে। কিন্তু যেখানে পাথুরে মাটী সেখানে বোরিং মেসিনে সরু গর্ত্ত করে' তার ভেতর বারুদ ও রজ্জুৎ দিয়ে দূর থেকে অগ্নি সহযোগে পাথর ফাটাতে হয়। তারপর আবার গাঁতি দিয়ে যতটা যায়গা আল্‌গা হয়ে গেছে ততটা খুঁড়ে আবার পূর্ব্বক্রিয়া সম্পাদন করতে হয়। এইরূপে পাথর খোঁড়াকে "মাইন" করা বলে। খাত খোঁড়বার কলও আছে কিন্তু সে কল পেছনেই কাজ করতে পারে, শত্রুর সামনে নয়। পাথুরে মাটিতেই খাত ভাল হয়—অর্থাৎ শক্ত হয়। নরম মাটীতে খাত তত শক্ত হয় না। গোলার আঘাতে সুড়ঙ্গ পর্য্যন্ত ধসে যেতে পারে। তবে খাত কাটলে

নরম মাটীতে ১৬ আনা না হলেও ৮ আনা যে লাভ তা'তে আর সন্দেহ নেই। সুড়ঙ্গের উপরিভাগ অর্থাৎ ছাদ খিলানের মত অর্দ্ধ-গোল করে' কাটতে হয়।

যেখানে ইচ্ছা খাত কাটলেই, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরাপদ হওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ খাত বেশী থাকে সমতল ক্ষেত্রে, যেখানে অন্য কোন স্বাভাবিক আড়াল নেই। পার্ব্বত্য টিলাময় দেশে পর্ব্বতের পাদদেশে ও তার কিছু উপর পর্য্যন্ত খাত থাকে। শত্রুর দিকের শীর্ষদেশে কিছুই থাকে না। দুটি টিলার মাঝের ক্ষুদ্র উপত্যকা-ভূমি ফাঁকা পড়ে থাকে, সেখানে কেবল মাঝে মাঝে কাঁটা-তারের বেড়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ সমতল ভূমিতে যথাযথ অন্তরে সর্ব্বত্রই প্রায় খাত থাকে। পার্ব্বত্য টিলাময় প্রদেশে টিলা ও গিরির পাদদেশে ও তার কিয়দ্দূর উপরিভাগ পর্য্যন্ত খাত থাকে। সমতল ভূমি অপেক্ষা ঐ স্থানের খাত খুব বেশী বাধা দিতে পারে। এই খাত ঘুরে টিলা ও গিরির পশ্চাৎদেশে গিয়েছে। টিলা ও গিরির পশ্চাৎদেশে মাথার উপর 'অবজার্ভেটরী' ও কামানের ব্যাটারী বসে। জঙ্গলের অনতিপশ্চাতেও কামান বসানর সুবিধা। শৃঙ্গ, টিলা, জঙ্গল ও ঝোপের আড়ালে, স্বাভাবিক কোন নদী বা ব্যবধান দ্বারা রক্ষিত কোন স্থান, যেখান হতে শত্রুর প্রথম খাত ভালরূপে দেখা যায়, সেখানে Machine Gun Battery বসে। প্রথম খাতেও প্রায় ১০০ গজ অন্তর অন্ততঃ একটী করে' Machine gun বা কলের বন্দুক থাকে। দ্বিতীয় খাতপুঞ্জে কুলি ও ইঞ্জিনিয়ার সৈন্তরা বাস করে। ঐ স্থান হতে হাতে বা গাধার পিঠে প্রথম খাতে খাবার আসে। গোলন্দাজেরা নিজেরাই রন্ধন করে' খায়। দ্বিতীয় লাইনের নিকটেই থাকে গুদাম, aeroplane shade.

তৃতীয় খাতপুঞ্জের নিকট অশ্বারোহীরা থাকে। তারা খাতে বাস করে না। পলাতক শত্রুদলকে তাড়া করাই তাদের একমাত্র কাজ। অসজ্জিত অবস্থায় থাকলে অশ্বারোহীরা পদাতিক ও গোলন্দাজদের আক্রমণ করে। কারণ সাজতে সাজতে, তারা ঘোড়া ছুটিয়ে শত্রুর ঘাড়ে এসে পড়ে। কিন্তু সজ্জিত পদাতিক বা গোলন্দাজের নিকট অশ্বারোহী এক মিনিটও টিঁকে না, কারণ তাদের লক্ষ্য করা অত্যন্ত সহজ।

উপরে যে রকমে খাত তৈরী করবার কথা বলা হল, সে রকম খাত করতে বহুদিন সময় লাগে। তাই কেবল যেখানে অনেক মাস ধরে' একই জায়গার উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ হয়, সেইখানেই এই রকম একটা বিরাট ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে করে' উঠতে পারা যায়। কিন্তু যখন যুদ্ধে হটাহটি খুব বেশী হয়, যখন সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ (manœuvre) হয় বেশী, তখন এতটা করে' উঠতে পারা যায় না। তখন যতটা হয় গভীর করে' মাঝে মাঝে খাত কাটা হয়। এই খোঁড়া মাটি আবার ছোট ছোট থলেয় ভরে' খাতের সামনে একগজ চওড়া করে' তাগাড় দেওয়া হয়। তাতে করেও খাতটা সামনের দিকে অনেকটা গভীর হয়ে পড়ে। সাধারণে যে sand-bag-এর কথা শুনে আসছে এইগুলো হচ্ছে তাই। মাটির বদলে বালি দিলে এই সুবিধে হয় যে বালি গর্ত্ত হয়ে গেলেও আবার আপনাআপনি পুরে যায়। কিন্তু খোয়া বা মাটির বস্তার উপর গোলা পড়লে সব ছাৎরাখ্যাৎরা হয়ে যায়। এইরূপে এক কোমর, অন্ততঃ এক হাঁটু, খাত খুঁড়ে তার পর সামনে মাটি জড় করে' কোন রকমে পদাতিরা কোথাও হাঁটু গেড়ে বসে' কোথাও বা শুয়ে প্রাণ বাঁচায়। এইরূপ খাত খোঁড়বার

ছোট ছোট কোদাল ও গাঁতি পদাতিদের কোমরেই থাকে। প্রতি ৩ জন পিছু ১ "সেট" যন্ত্র থাকে। প্রথম লোকটির কোমরে থাকে ছোট কোদাল, দ্বিতীয়ের কাছে গাঁতি এবং তৃতীয়ের কাছে কাঁটা-তার কাটবার বড় কাতুরি। এইরূপে স্বল্প খনিত খাতের সহিত স্বাভাবিক বাধাবিঘ্নকে যোগ করে' একটা কাজ চালান গোছের বাধা (System of defence) রচনা করা হয়। কিন্তু এরূপে তাড়াতাড়ি যা-হয়-কিছু একটা বাধা (System of defence) রচনাকালেও যাতে পূর্ব্বোক্ত খাত রচনা-প্রণালীর সঙ্গে যতদূর সম্ভব এটার মিল থাকে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়।

উপরোক্ত বালির বস্তা ছাড়া খাতের সামনে কাঁটা-তারের বেড়া থাকে। বেড়াগুলি এক লাইনে নয়। মাকড়সার জালের মত, খোঁটায় জড়িয়ে জড়িয়ে তৈরী ; বেড়া চওড়ায় প্রায় ২০।২৫ হাত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং লম্বা যতদূর ইচ্ছা হতে পারে। ঘোড়া পর্য্যন্ত এই বেড়া ডিঙিয়ে আসতে পারে না। লাফ দিলে কাঁটা-তারের মধ্যে এমন গেঁতে যাবে যে আর তাকে এক পা'ও নড়তে হবে না।

এই শত শত মাইল খাত ব্যেপে, বৎসরের পর বৎসর দিবারাত্র খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলছে। কারণ বর্ত্তমানে খাতের বহুল প্রচলনে বড় একটা আক্রমণ করে' তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করবার সুবিধে নেই। এখন অল্পবিস্তর আত্মরক্ষা করেই প্রতিপক্ষদের অপেক্ষা করতে হয়—কবে শত্রুর রসদ ফুরোবে অথবা মন ভাঙবে। বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে, ৪ বৎসর যুদ্ধের মধ্যে, বোধ হয় ৬ মাসও বড় রকমের আক্রমণে অতিবাহিত হয়নি। প্রথম আক্রমণ হয়, যখন মিত্রশক্তি স্বল্পায়ুধ অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে, জার্ম্মাণী এই আক্রমণের অগ্রণী, এই আক্রমণ ২ মাসের

অধিক টিঁকেনি। মার্ণ ও ইপ্রেস্ যুদ্ধের পর খাত খোঁড়বামাত্র এই আক্রমণ শেষ হয়। তারপর বড় আক্রমণ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে। জার্ম্মাণী যখন দেখলে আমেরিকার যোগে মিত্র-শক্তির দিন দিন মনের বল, লোক, অস্ত্র ও অর্থশক্তি বাড়ছে তখন তারা ভাবলে যে এখনও তাদের লোকবল বেশী আছে, যদি এই বেলা প্রাণপণ করে' মিত্রশক্তিকে হারাতে না পারে তাহলে শেষে তাদেরই হারতে হবে। এই ভেবে প্রাণের দায়ে মার্চ্চ মাসে জার্ম্মাণ-আক্রমণ আরম্ভ হয়। কিন্তু সে আক্রমণ বেশী দিন টিঁকেনি। এর কিছুদিন পরে যেই জার্ম্মেণীতে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হল, খাবার জন্য লুটপাট চলতে লাগল, এবং লোকে জয়ের আশা ত্যাগ করল, অমনি 'ফক্', মিত্রশক্তির হয়ে, শত্রুদের তাড়া করে' বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। এই তিন বৃহদাক্রমণের কাল বোধ হয় ৬ মাসের অধিক নয়। কাজেই এই ৬ মাসে যুদ্ধ-জয় হয়েছে, যদি কেউ এরূপ ভাবেন, ত তিনি মহা ভ্রমে পতিত হবেন। ৪ বৎসরের অবশিষ্ট ৩৷৷০ বৎসরেই সত্যযুদ্ধের ফলাফল নির্ণীত হয়েছে। ঐ সময়ের ক্রমাগত গুঁতোগুঁতিতে ও অজস্র অর্থ-ব্যয়ে এক একটা দেশ একেবারে ছারেখারে গেছে!

বড় বড় আক্রমণ বেশী না হ'লেও ছোট ছোট লড়ায়ের সংখ্যা নেই। বড় আক্রমণ ও ক্ষুদ্র আক্রমণে তফাৎ এই যে বৃহদাক্রমণের আয়োজন বৃহৎ এবং বহু দিন বা মাস পূর্ব্ব হ'তেই তার কর্ম্মারম্ভ। যেমন গরীবের বাপের শ্রাদ্ধে ও রাজার বাপের শ্রাদ্ধে তফাৎ। তাছাড়া এ দুয়ের ব্যবহারিক জগতে ফলাফল অবশ্য বিভিন্ন। শ্রাদ্ধে বৃযোৎসর্গে যেমন লোকের নাম যশঃ ও প্রতিপত্তি বাড়ে, বৃহদাক্রমণে কৃতকার্য্য হ'লেও শত্রুর উপর নৈতিক

ও সামরিক একটা আধিপত্য পাওয়া যায়। কিন্তু বৃহৎ কাজকর্ম্মে যদি একটা গোলযোগ উঠে সব পণ্ড হয়ে যায় তখন যেমন কর্ম্মকর্ত্তার অর্থনাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আর মুখ দেখাবার সাহস থাকে না—সেইরূপ বৃহদাক্রমণে হারলে স্বল্পবল শত্রুর নিকটও আর ব্যর্থ-মনোরথ-প্রতিপক্ষ সাহস করে' এগুতে পারে না। এইরূপ কিছু কিছু তফাৎ ব্যতীত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আক্রমণের ব্যবস্থা-পত্র ও ফলাফল প্রায় একই।

আক্রমণ করবার আগে প্রথম বেতারযন্ত্রে সংবাদ নেওয়া হয়, আক্রমণ স্থানের ২।৪ শ' মাইল্ দূর পর্য্যন্ত জল-বায়ুর অবস্থা কি। অর্থাৎ আক্রমণ কালে বৃষ্টিপাত অথবা ঝটিকাবর্ত্তের সম্ভাবনা আছে কি না। তারপর সাধারণতঃ ভোর রাত্রে আক্রমণ আরম্ভ হয়। বড় আক্রমণ হ'লে, ১৫ দিন পূর্ব্ব থেকেই বড় বড় কামানের গোলায় শত্রুর ব্যাটারী, খাত, বেড়া, প্রাকার, রাস্তা ইত্যাদি ভাঙ্গা আরম্ভ হয়। ছোট আক্রমণে, ১০।১৫ মিনিট বা ২।১ ঘণ্টা এমনকি ৫।৭ মিনিট পূর্ব্বে বড় গোলায় কাঁটা-তারের বেড়া ও প্রাকার উড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর পদাতিক বন্দুক নিয়ে খাত থেকে লাফিয়ে উঠে শত্রু-খাতের দিকে ছোটে। শত্রুর ব্যাটারী বড় আক্রমণের সময় ১৫ দিন পূর্ব্ব থেকেই প্রতিপক্ষের যা কিছু আছে সব ভাঙ্গতে চেষ্টা করে এবং ছোট আক্রমণের সময় গোলার আওয়াজ শোনবামাত্র শত্রু প্রতিপক্ষের প্রথম লাইনে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করে—যাতে পদাতিকরা হঠাৎ দল বেঁধে বার হ'তে না পারে। ছোট আক্রমণে, প্রথম গোলার আওয়াজ ও পদাতির নিষ্ক্রমণের মধ্যে ৫।৭ অথবা ১০ মিনিট ব্যবধান থাকে। এই সময়ের মধ্যে হয়ত ঘুম থেকে উঠে কোন্ বিন্দুতে গোলা ফেলতে হবে খবর পেয়ে, তালিকা দেখে দিক ও দূরত্বের কোণ বের করে'

কামান ঘুরিয়ে, তাকে লক্ষীভূত করে’ গোলা ভরে ছুঁড়ে অদৃষ্ট শত্রু-পদাতির নিষ্ক্রমণ নিবারণ করতে হয়। এ থেকে পাঠক বেশ বুঝতে পারবেন গোলন্দাজদের কত চটপটে হতে হয়; তার পরে কাজের অভ্যাস তাদের কত এবং নানারূপ সূক্ষ্ম যন্ত্র ব্যবহার করবার ও যথাস্থানে সাজিয়ে রাখবার কায়দা কেমন। এইরূপে যখন আক্রান্ত পক্ষের গোলন্দাজরা, আক্রমণকারীদের প্রথম খাতে গোলা ফেলতে থাকে তখন আক্রান্তদের পদাতিরা যে যার নিজের নিজের যায়গায় এসে দাঁড়ায় এবং বন্দুক ও কলের বন্দুকের (machine gun) নল শত্রুর দিকে ধরে। এই সময় খাত পরস্পরের কাছাকাছি হ’লে টরপিডো ও বোমা হরদম চলতে থাকে। আক্রমণকারীরাও কলের বন্দুক সব ঘুরিয়ে ধরে। এইরূপে যখন গোলার আঘাতে শত্রুর বেড়া ও প্রাকার সব উড়ে যায় তখন আক্রমণকারীদের পদাতি “জয় দুর্গা” বলে’ লাফ দিয়ে উপরে ওঠে। এখন লক্ষ গুলি এক সঙ্গে ছোটে এবং কলের বন্দুক নল নেড়ে নেড়ে, মিনিটে ৪০০।৫০০ গুলি ছুড়ে’ নিষ্ক্রান্ত পদাতিককে কাস্তের সামনে ধানের মত শুইয়ে দেয়। এই সময় উভয় পক্ষেরই বড় কামান শত্রুর দ্বিতীয় লাইনে গোলা মারতে থাকে—যাতে কোনো পক্ষেই নতুন লোক এসে প্রথম লাইনের লোকদের সঙ্গে যোগ দিতে না পারে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে উভয় দলের Field artillery গোলা ছুঁড়তে আরম্ভ করে। তাদের এক একটা ছোট গোলা হাওয়ায় ফেটে কিম্বা মাটিতে পড়ে’, ২।৩ হাজার টুক্‌রো হয়ে যায়। এবং এই একটা টুক্‌রো জায়গা-মত মানুষের গায়ে লাগলে তাকে দু’আধখানা করে’ দিতে পারে। এই ছোট কামানের গোলা অবিরল বৃষ্টি ধারার মতো পড়ে আপনাপন

লাইনের সামনে কিছু দূরে এক একটা জ্বলন্ত লৌহ প্রাচীরের সৃষ্টি করে। আক্রমণকারীরা যতই অগ্রসর হয় ততই তাদের গোলা-দ্বারা-নির্ম্মিত সেই প্রাচীরও তাদের সাম্‌নে অগ্রসর হয়। কিন্তু শত্রুর প্রাচীরটী স্থির ভাবে অবস্থান করে। শত্রুর এই লৌহপ্রাচীর ভেদ করে', কলের বন্দুকের কোটী গুলি কাটিয়ে আক্রমণকারীদের এগুতে হয়। দুই দলের খাতের মধ্যে যদি ব্যবধান অল্প থাকে (অর্থাৎ ১৫।২০ গজ) তাহ'লে এক ছুটে আক্রমণকারীরা শত্রুর খাতে গিয়ে লাফিয়ে পড়ে। দূরত্ব বেশী হ'লে ১০।১৫ গজ গুঁড়ি মেরে ছুটে গিয়েই তারা শুয়ে পড়ে এবং শত্রুর দিকে গুলি চালায়। সেই সময় সাম্‌নের শত্রুরা একটু মাথা নীচু করতে বাধ্য হয়। অমনি আক্রমণকারীদের আর এক দল ২০।২৫ গজ গুঁড়ি মেরে ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়ে' শত্রুর উপর গুলি চালায়। তখন প্রথম দল আবার গুঁড়ি মেরে ছুটে দ্বিতীয় দলের ১০।১২ গজ আগিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ে' শত্রুর খাতের উপর গুলি চালায়। এইরূপে যখন দু'দল খুব কাছাকাছি এসে পড়ে (১০০ হতে ১০০ গজ পর্য্যন্ত ব্যবধানে) তখন উভয় দলে বন্দুকের ভরা টোটাগুলি তাড়াতাড়ি আওয়াজ করতে থাকে। ফরাসী 'লেবেল্' বন্দুকে ১০টা টোটা ভরা থাকে। এইরূপ তাড়াতাড়ি গুলি চালানর সময় টোটা ভরবার সময় যাতে দরকার না হয় তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু লেবেল বন্দুকের দোষ এই যে একবার ১০টা টোটা ফুরিয়ে গেলে একটা একটা করে' ভরে' আওয়াজ করা ছাড়া আর উপায় নেই। আবার মাঝে মাঝে কল খরাপ হয়ে যায়। কিন্তু জার্ম্মাণ ও ইংরাজ বন্দুকে ৩টা বা ৪টা করে' টোটা টিন কেসে ভরা থাকে। তাদের একাদিক্রমে ১০টা ছোঁড়বার উপায় না থাকলেও দুবার ভরলেই তাদের

সেই কাজ হয়। এতে তাদের নয় দু সেকেণ্ড সময় নষ্ট হল, কিন্তু ফরাসীর ১০টা গুলি ফুরোলে যখন তারা প্রতিবার একটা একটা করে' টোটা ভরতে বাধ্য হয় তখন ইংরাজ বা জার্ম্মাণ এক একবারে ৪।৫টা টোটা ভরতে পারে। এতেই ইংরাজ ও জার্ম্মাণ বন্দুকের উৎকর্ষ প্রতীয়মান হয়। যাইহোক, এই কথাটা বুঝতে পেরে, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের মডেল বন্দুকে, ফরাসীরাও catridge case ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে।

এইরূপে যে যত পারে লোক মেরে ২।১ মিনিটের মধ্যেই বোমা রিভলভার হাতে অথবা বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে আক্রমণকারীরা ছুটে গিয়ে শত্রুখাতে লাফিয়ে পড়ে। সেখানে যদি আক্রমণকারীরা সব হতাহত হল অথবা ধরা পড়ল, তাহলে আবার আক্রমণ সুরু হবে। আক্রমণকারীরা জিতলে তারা তখনি সাময়িক একটা প্রাকার দিয়ে প্রথম লাইনটা রক্ষা করতে চেষ্টা করে; কারণ শত্রু এক লাইন ছেড়ে তখনি আবার ভীমবেগে পাণ্টা আক্রমণ করবে। এই পাণ্টা আক্রমণে অধিকাংশ আক্রমণকারীকেই স্থানচ্যুত হতে হয়।

এইভাবে ক্রমে প্রথম খাতপুঞ্জ দখল হলে দ্বিতীয় খাতপুঞ্জের উপর আক্রমণ হয়। তারপর শত্রু পালাতে থাকে, তখন পালাবার লাইনে একটু ঢুকে গিয়ে ডান ও বাঁধার থেকে তাদের ঘিরে ফেলতে হয়। এই সময় অশ্বারোহীদের বড় দরকার। পশ্চাদ্ধাবন করে' লাইন ভেঙ্গে ঢুকে সামনে থেকে তাড়া দেবার জন্য তাদের আবশ্যকতা। তখন ভীষণ ছুটোছুটি আরম্ভ হয়। আক্রমণকারীরা তখন আগিয়ে দেয় অশ্বারোহীদের; পলায়নকারীরা পিছিয়ে দেয় পদাতি ও অশ্বারোহীকে, আর কামানগুলো সব আগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এরকম ছুটোছুটি যুদ্ধ ইউরোপীয় মহাসমরে বড় বেশী হয় নি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কামান ও গোলা

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখেছি যে, যুদ্ধকালে আক্রমণ ও আত্মরক্ষায়, উভয় সময়েই খাতের কিরূপ আবশ্যকতা। কিন্তু পূর্ব্বের এইসব কথা শুনে কেউ না মনে করেন যে লাইন-কতক খাত কেটে বাড়ী গিয়ে ঘুমোলেই দেশ রক্ষা হবে। সকলেরই মনে রাখা দরকার যে খাতকে কামান, বন্দুক ও বিন্দু বিন্দু বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করলেই তবে খাতটা অলঙ্ঘনীয় হয়ে ওঠে। কামান বন্দুকের স্বল্পতা থাকলেও খোলা মাঠের চাইতে, গর্ত্তে ও খাতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা অবশ্য ঢের সুবিধাজনক—কারণ খাতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলে হতাহতের সংখ্যা হয় অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কিন্তু যদি পিছনে দস্তুর মত কলের কামান (quick firing gun) ও কলের বন্দুক না থাকে তাহলে কেবল পদাতি সৈন্য, খাতেও শত্রুর কামানের সামনে টিঁকতে পারে না। তবে খোলা-মাঠের চাইতে বেশীক্ষণ টিঁকতে পারে এটা ঠিক। একবার বল্‌ছি, "খাতে সুবিধা" আবার বলছি "না"—এইসব কথা শুনে পাঠক রেগে যাবেন না! যা বল্‌ছি তাই ঠিক। পাঠক যদি আমার কাছ থেকে এমন একটা "কায়দার" আশা করেন, যা আপনাদের বলে' দিলে, আর কারও কোন কায়দা কখনও আপনাদের হারাতে পারবে না—তাহলে আমাকে বল্‌তেই হবে যে সেরকম লড়ায়ের "পরেশ পাথর" আমার কাছে নেই। সকল জিনিষেরই স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে দাম, শক্তি বা উপকারিতা বাড়ে

বা কমে। যে সকল পাঠকের পৃথিবীর কাজকর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, তাঁরা অবশ্য জানেন যে কতকগুলোর অবস্থা (conditions) ঘটলেই তবে একটা কায়দা খাটে। সেই অবস্থাপুঞ্জের অভাবে 'কায়দা' বা 'প্যাচটা' ফস্‌কে যায় ; এমন কি কখন কখন আবার তার প্রতিক্রিয়ার জালায় অস্থির হতে হয়। এই যেমন গ্যাস। শত্রুর দিকে ত ছাড়লুম—আর যদি হঠাৎ হাওয়া ঘুরে যায় তাহলেই "আপন পায়ে কুঠারাঘাত!" অতএব জীবনের বস্তুতন্ত্র-অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন কোন পাঠকই যুদ্ধের সকল কয়দার একটা "নির্য্যাস" বা বীজমন্ত্র" আমার নিকট হতে আশা করবেন না। দুটো অবস্থা (condition) ঘটলেই খাত অলঙ্ঘনীয় হয়ে উঠে। ১ম—রীতিমত কাটা খাত ও তার ভেতর দস্তুরমত পদাতি সৈন্য—বোমা, বন্দুক ও কলের বন্দুক নিয়ে। ২য়—খাতের পেছনে দস্তুরমত '৭৫' মিঃ মিঃ হতে '১৫৫'-মিঃ মিঃ ফাঁদ কলের কামানের ও কলের বন্দুকের ব্যাটারী। যদি সসৈন্য খাত থাকে ও তাকে রক্ষা করবার জন্য পেছনে পাহাড় বা পরিখার আড়ালে কলের কামান ও কলের বন্দুকের ব্যাটারী থাকে, তাহলে খাত পার হওয়া ও জ্বলন্ত একটা অগ্নিকুণ্ড পার হওয়া দুইই সমান। অর্থাৎ যদি খাত থাকে ও তাকে রীতিমত রক্ষা করা হয়, তাহ'লে দুর্গের চাইতেও তার বাধা দেবার শক্তি বাড়ে। অতএব পাঠক বোধ হয় বুঝতে পারছেন যে কেবল লাইন-কতক খাত কেটে বাড়ী গিয়ে ঘুমলে চলবে না, পরন্তু রাত জেগে, তাকে ফোঁটা ফোঁটা বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে হয়। সুধু তা হলেই হ'ল না, আবার কামান চাই—অর্থাৎ অসংখ্য গোলা চাই—অর্থাৎ দিনে কোটী কোটী গোলা তৈরী করবার জন্য কারখানা চাই। কামান চালাবার জন্যে যে

শিক্ষিত গোলন্দাজ চাই তা বলাই বাহুল্য। তবে গরীবের যুদ্ধে, ইউরোপের মত কোটী কোটী গোলা প্রতিদিন নাও দরকার লাগতে পারে।—আবার "একবার কোটী কোটী গোলা চাই", এবং তার পরই "চাই না" বলছি বলে' পাঠক মহাশয় যেন রেগে যাবেন না!—যা বলছি তা ঠিক,—কারণ গরীব আফ্রিকা ও এশিয়া, ইউরোপ নয়। যেমন ঠাকুর ও পূজুরী, নৈবেদ্যর সরঞ্জামটা তার অনুরূপই হবে, এতে আর রাগ করবার কথা কি আছে?—তবে কিছু যে সরঞ্জাম দরকার এটা ঠিক। তাহলে এখন কথা হচ্ছে এই "কিছুর" মানে—কতটা?—এই "কতটা"র উত্তর দেবার মত পরিমাণ-জ্ঞান (sense of proportion) যার আছে, সে হচ্ছে জেনেরাল এবং যে এ কথার উত্তর দিতে পারে না, অথচ সাহসী এবং খাটিয়ে লোক, সে হচ্ছে সাধারণ সৈন্য।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে খাত কেটে, কামান নিয়ে রুকে দাঁড়ালে, তবে খাত সত্যই অনতিক্রমণীয় হয়ে উঠে। রাশিয়ানরা খাতও কেটেছিল, বুকের রক্ত দিতেও কম করে নি, কিন্তু জার্ম্মাণীর গুঁতোয় তারা এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠতে পারে নি। এর একমাত্র কারণ তাদের কামনের অভাব—গোলা ও বারুদের অভাব। শেষকালে হেরে পালাবার সময় তারা সেই বর্ব্বর যুগের মানুষের মত, পলায়ন পথে, আপনার দেশের গ্রাম, পল্লী, জনপদ, নগর ও সহর সমূহে একধার থেকে আগুন দিয়ে গেছল। ব্রেষ্ট-লিটভ্স্কের মত বড় সহরও এইরূপ অগ্নি সংযোগ হতে রক্ষা পায় নি। নেপোলিয়নকেও, মস্কো-পথে, "নিজের ঘরে আগুন দিয়েই" রাশিয়ানরা বাধা দিয়েছিল। তবে এই বাধা, কেবল দু'চার ঘণ্টার জন্য। কিন্তু এই সামান্য দেরী করবার জন্যে সারা দেশটাকে পুড়িয়ে দেওয়ায় লাভের চাইতে ক্ষতিটা

যেন বেশী হয়ে গেছে বলেই মনে হয়। অন্ত কোন সভ্য দেশে বোধ হয় এরূপ আদিম প্রথা অবলম্বন করবে না। তবে রাশিয়ানদের “ঘরে আগুন দেওয়া” বা “আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা”র অভ্যাসটা এতদূর—যে বাইরে একটু গোলমাল হলেই তারা আগু থেকে আপনার ঘরে আগুন দিয়ে ফেলে।

অতএব এখন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, খাত কেটে বাড়ী গিয়ে শুয়ে থাকলে বা খাতে দাঁড়িয়ে কেবল বন্দুক নিয়ে দুম্ দাম্ করলে হবে না, এবং ‘ঘরে আগুন দিয়েও’ যে যুদ্ধের বিশেষ কোন সুবিধা হবে তা’ও মনে হয় না—চাই কামান, গোলা ও বারুদ। যুদ্ধের প্রথম-ভাগে ফ্রান্সে এই ধারণা হয়েছিল যে, বেশী সৈন্ত থাকলেই যুদ্ধে জয় হয়। এই ধারণাটা, অবশ্য জার্ম্মাণদের বড় বড় দল বেঁধে আক্রমণ-রূপ-কার্য্যের সঙ্গে (attack “en masse”) তাদের বিভিন্ন কারণে জয়রূপ ফল যোগ হয়ে, মনুষ্য-মনস্তত্ত্বের এক অদ্ভুত নিয়মানুসারে, আপনা আপনিই লোকের মনে সৃষ্টি হয়ে গেছল। মনস্তত্ত্বের যে নিয়মানুসারে এই মিথ্যা ধারণাটা সমগ্র মিত্রশক্তিকে ছমাসের অধিক ভুলিয়ে রেখেছিল, সেটা পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন। ব্যাপারটা কতকটা “কাকতালী”র মত। হঠাৎ দেখলুন একটা কাক তালগাছে এসে বসল—আর অমনি টিপ্ করে’ একটা তাল পড়ল! এ থেকে মানুষের মন তখনি ধারণা করে’ নেবে যে, কাক বসাই তাল পড়ার কারণ। কোটীর মধ্যে একটী লোক বোধ হয় সন্দেহ করবে যে, তালটি পড়ার অন্ত কোন কারণ থাকতে পারে—“হয়ত বা ইঁদুরে বোঁটা কেটে ফেলে দিয়েছে—”, “হয়ত বা গোড়া আল্গা হয়ে আপনা আপনিই তালটা পড়ে গেছে।” যিনি এইরূপ সন্দেহ করেন তিনি

মনীষী, বৈজ্ঞানিক। কিন্তু আমরা সকলেই এইরূপ আপাত-দর্শনের দ্বারাই সিদ্ধান্ত করে' থাকি। সারা জীবন পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও সন্দেহ (doubt) করে' করে' যার হাড় পেকে গেছে, তারই মনে হওয়া সম্ভব, যে "তাল পড়ার অন্য কোন কারণও থাকতে পারে।" ঠিক এই নিয়মেই, একমাত্র সৈন্য সহায়েই যুদ্ধ জয় হয়, এই ভুল ধারণাটা, মিত্রশক্তির মনে জন্মেছিল। যখন ফ্রান্সের লোকে দেখলে যে জার্ম্মাণরা আক্রমণ করতে ছুটবার সময় মামুলী যুদ্ধ রীতির অনুসারে ফাঁক ফাঁক হয়ে না এসে, বন্যার স্রোতের মত, দলের পর দল, পিছনে পিছনে, ছুটে আস্‌ছে, তখন ফরাসীদের কাছে এটা একেবারেই অদ্ভুত বলে বোধ হল। সকলেই ভাবতে লাগল, "এর একটা কি অদ্ভুত মানেই না থাকবে!" তারপর যখন লোকে দেখলে যে, জার্ম্মাণরা প্রতি যুদ্ধেই জিতছে—তখনই এক লাফে দেশশুদ্ধ লোক, (মনস্তত্ত্বের পূর্ব্বোক্ত আইন অনুসারে) এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হল, যে জার্ম্মাণ-জয়ের একমাত্র কারণ, ঐ অদ্ভুত আক্রমণ-পদ্ধতিটা, যেটার অর্থটা এতদিন কিছুতেই বুঝতে পারা যাচ্ছিল না। "বাস্, আর কি! এইবার বুঝেছি" বলে'—পৃথিবীশুদ্ধ লোকে জয়ধ্বনি করে' উঠল। তারপর লোকের মুখে মুখে কথার রং চড়ে শেষকালে, mental contagion'এর ফলে (মনে মনে ছোঁয়াচ লেগে), এই দাড়াল যে, যুদ্ধে একমাত্র দরকার, গাদাখানেক সৈন্য—কেননা দলবেঁধে আক্রমণ করতে হবে, কারণ এইরূপ আক্রমণ করেই জার্ম্মাণরা প্রতিযুদ্ধে জিতেছে! তাই লোকে সৈন্য সংগ্রহ করতে ছুটল। সমর-সচিব ফ্রান্সে, গোলা-বারুদের কারখানার কারিকরদের পর্য্যন্ত, দল ভারি করবার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন। কেউ একবার প্রশ্ন পর্য্যন্ত করলে না, যে জার্ম্মাণ জয়ের জন্য,

"দল ভারি করে' আক্রমণটা," কতটা দায়ী। দেশের ঋষি, মুনি, কবি, সেনাপতি, কারিকর, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, কারও মাথায় এই সন্দেহটা হল না—যে জার্ম্মাণ জয়ের হয়ত বা অন্য কোনও কারণ থাকতে পারে— "অন্ততঃ ভেবেই দেখা যাক না।"—যে কথাটা দেশসুদ্ধ লোক মেনে নিয়েছে, তাকে যে সন্দেহ করতে পারে সেই জগতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

সংখ্যার নিশ্চয়ই একটা মূল্য আছে—moral এবং physical— তার কথা পরের অধ্যায়ে বলা হবে। কিন্তু একমাত্র দলে ভারি হলেই যুদ্ধ জয় হয় না। রুষদের সংখ্যা বড় কম ছিল না, তবুও তারা সর্ব্বত্রই হেরেছে। তার কারণ পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু দেশসুদ্ধ লোকের ধারণার বিরুদ্ধে, এই সমসাময়িক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তটাও ঠিক্‌রে চলে' গেল। বিশ্বাস (conviction) জিনিষটা এক অদ্ভুত উপায়ে জন্মায়—ক্রমে ক্রমে। কিন্তু একবার চিত্তে একটা ধারণা ঢুকলে তারপর সহস্র প্রমাণেও তার কিছু করতে পারে না। সুতরাং একমাত্র সংখ্যার জোরেই যুদ্ধ জয় হয় না। কিন্তু এই সহজ কথাটা বুঝতে, মিত্রশক্তির অন্ততঃ ছ মাস সময় এবং দশ লক্ষ জীবন খরচ হয়েছে।

যুদ্ধের ব্যাপার দেখে এখন সকলেরই ধারণা হয়েছে যে লোক-সংখ্যার চাইতে কামান-সংখ্যা যুদ্ধ জয়ে বেশী সহায়তা করে। প্রথম প্রবন্ধেই আমরা বলেছি যে এখন যুদ্ধটা আর ব্যক্তিগত নেই, এখন সব কাজটা দাঁড়িয়েছে সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্ম (collective action), বা কলের কাজের মত। কেউ যুদ্ধের সবটা করে না, কিন্তু "জুতো-সেলাই" soldier থেকে চণ্ডী পাঠক Military correspondent, পাদ্রী ও গোয়েন্দা প্রভৃতি প্রত্যেকে যদি নিজের নিজের কাজ না করে তাহলে আজ কালকার যুদ্ধ তিনদিন চলে না।

আজকাল পৃথিবীর অনেক বড় বড় লোকের ধারণা যে, "যে-দেশে লোহা ও কয়লা বেশী আছে এবং কতকগুলো উঁচুদরের মানুষ আছে সেই দেশই সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ কতকগুলো ছাগল গরুর অভাব সহজেই যন্ত্র দিয়ে পূর্ণ করা যায়!" তেমনি আজকালকার জেনারেলদেরও ধারণা যে বহু সংখ্যক সৈন্যের চাইতে অল্প সংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য এবং গাদাখানেক কলের কামান ও কলের বন্দুক থাকলে যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা বেশী। এই কামান ও গোলা বারুদের অভাবেই, সংখ্যায় অধিক হলেও রাশিয়ানরা সর্ব্বত্রই হেরে মরেছে। একটা ১০০০ গজ লম্বা খাতপুঞ্জের পিছনে যদি গোটা ছয়েক কলের কামানের এবং গোটা চারেক কলের বন্দুকের ব্যাটারী থাকে, তাহলে তার কাছে ঘেঁসে এমন সাধ্য কারও নেই। এরকম "স্বল্প-রক্ষিত" খাতপুঞ্জকেও জোর করে' দখল করতে হলে গোলাবৃষ্টি দ্বারা সেই যায়গাটাকে চষে না ফেললে উপায় নেই। যদি একটা হিসাব ফাঁদা যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে ১০০ × ১০০০ বর্গ গজের প্রতি ১০ বর্গ গজে একটা করে' গোলা না ফেললে এ খাত দখল করা অসম্ভব। * অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই ১০০০ গজ খাত দখল করতে প্রায় ১০ × ১০০০ গোলার দরকার। সাধারণতঃ এর চাইতে ঢের বেশী গোলা খরচ হয়। তারপর কলের বন্দুকের গুলী—যেখানে, দশ হাজার গোলা খরচ হয়—সেখানে কোন্ না দশলাখ খরচ হবে। পাঠক এখন গোলার খরচটা দেখলেন। পূর্ব্বে এক যায়গায় কামান ধরে' (১৯১৪।১৬

* ১০০ × ১০০০ :—১০০০ সংখ্যাটী যেন হচ্ছে খাতপুঞ্জের দৈর্ঘ্যের মাপ। ১০০ সংখ্যাটি হচ্ছে খাতপুঞ্জের চওড়ার মাপ। চওড়ার মাপটী সব চাইতে কম করে' ধরা হয়েছে।

খৃষ্টাব্দের হিসাবে) প্রতিদিন কত গোলা খরচ পড়তে পারে, তা দেখান হয়েছে। এখানেও একটা হিসাব করা যেতে পারে। কিন্তু ওসব হিসাব ছেড়ে এক কথায় এই বললেই হবে যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সমর-সচিব ভাবতেন যে প্রতিদিন ১৩,০০০ গোলা নির্ম্মাণের সরঞ্জামটা বড় বেশী। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সত্যই সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত দিনে গড়ে ৭০০০এর বেশী গোলা খরচ হয়নি। কিন্তু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিদিন কেবলমাত্র ৭৫ মিঃ মিঃ কামানের জন্য ৮০,০০০ গোলা তৈরী করতে হত। তার উপর কত গোলা পূর্ব্ব থেকে মজুদ ছিল তার ঠিক নেই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের সংখ্যাটা এর বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

—:*:—

সংখ্যা ও শক্তি

পূর্ব্বপূর্ব্ব অংশে, আধুনিক যুদ্ধ জয়ে, সংখ্যার চাইতে কামানের কত বেশী দরকার তা একটু একটু দেখান হয়েছে। কিন্তু তাই বলে' সংখ্যার যে কোন মূল্য নেই তা নয়। এ সম্বন্ধে জার্ম্মাণ জেনেরাল বার্ণহার্ডি যা লিখেছেন তাথেকে কিছু কিছু তুলে' দেওয়া হল। সংখ্যা ও শক্তির কথাটা তিনি চারদিক দিয়ে খুব ভাল করেই বিবেচনা করে' দেখেছেন।—

"সেনানায়ক ও জেনেরালদের মনে রাখা উচিত যে হৃদয় ও চরিত্রের বল যুদ্ধক্ষেত্রে সংখ্যার শক্তির চাইতে বেশী দরকারী। যদিও একটা সেনাদলের হৃদয়ের শক্তির পরিমাপ করবার কোন যন্ত্র নেই, এবং এই আন্তরিক শক্তির সঙ্গে বাহ্যিক সংখ্যার হারাহারির সম্বন্ধ কি তা'ও এখনো নির্ণীত হয় নি, তাহলেও সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে হৃদয় ও চরিত্র-বল সংখ্যা এমনকি কিয়ৎপরিমাণ বন্দুক ও রসদের অভাবকেও অতিক্রম করতে পারে। একটা মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, চরিত্র ও ত্যাগের দৃষ্টান্তে একটা গোটা "আর্ম্মি" তার বহু অক্ষমতাকে অতিক্রম করে। সুধু "আর্ম্মি" কেন, একটা বৃহৎ জাতিও নবজীবন এবং নবশক্তি প্রাপ্ত হয়। যখন তুল্য বলশালী দুটো জাতির মধ্যে যুদ্ধ হয়, সেটা সাধারণতঃ (অধুনাতন যুগে) বহুদিন ধরেই চলে। এইরকম-ভাবে শক্তি উভয় দিকেই ক্রমে ক্রমে কমে আসে। কিন্তু শেষে তারই

জয় অবশ্যম্ভাবী, যে এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে বেশী চরিত্রবল ও ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাতে পারে। কিন্তু যদি সমশক্তিশালী দুটো জাতি হৃদয় ও চরিত্রবলে সমান হয়—তাহলে যে জাতি অর্থ ও রসদ আর যোগাতে পারে না তারই হার হয়।"

অতএব পণ্ডিত জেনেরাল বার্ণহার্ডির অভিমতে সৈন্যদলের চরিত্র ও হৃদয়ের বল অনেকটা সংখ্যার শক্তিকে অতিক্রম করে, এইটে বোঝা যাচ্ছে। বার্ণহার্ডি স্থানান্তরে আরও লিখেছেন :—

"১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে (ফ্র্যাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধে) ফ্রান্সের সৈন্য জার্ম্মাণদের চাইতে ঢের বেশী ছিল। তাদের ব্যক্তিগত সাহসেরও অভাব ছিল না। কিন্তু জার্ম্মাণীর, সমষ্টিগত হৃদয় ও চরিত্রবলে বলীয়ান Solid Battalionগুলোর উপর পড়ে' তারা কোথায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধেও রুষ সৈন্য সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও অধিকাংশ স্থলে চরিত্র (discipline) এবং হৃদয় বলে বলীয়ান ক্ষুদ্র জাপানী সেনাদলের নিকট হার মানতে বাধ্য হয়েছিল।"

কিন্তু দুটো সৈন্যদলের মধ্যে যদি আকাশ পাতাল সংখ্যার তারতম্য থাকে তাহলে সংখ্যার চাপে জয় অব্যর্থ হয়ে ওঠে। জেনেরাল বার্ণহার্ডি লিখেছেন,—

"ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও সমষ্টিগত মনস্তত্ত্বের আলোচনা করে' দেখা গেছে যে একটা সীমার পর সংখ্যাধিক্যকে আর হৃদয়ের বল দিয়ে জয় করা যায় না। সংখ্যা যেখানে অত্যধিক তার বিরুদ্ধে মানুষের ব্যক্তিত্ব কেন দেবতার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাও ম্লান হয়ে যায়। এবং সংখ্যাটা যদি বীভৎস রকমের বড় হয় তাহলে এই একমাত্র সংখ্যাধিক্য সকল রকম চরিত্রবল ও হৃদয়ের বলকে ধ্বংস করতে

পারে। (১) অতএব দেখা যাচ্ছে যে একজন প্রতিভাবান সেনাপতি একটা সীমা পর্য্যন্ত সংখ্যার ন্যূনতাকে অতিক্রম করাতে পারে। একটা সঙ্কটসীমা (critical point) অতিক্রম করলে সংখ্যার শক্তি সকল প্রকার শক্তিকে চেপে মেরে ফেলে।"

পৃথিবীর নানা যুদ্ধ পরিদর্শন ও তার কথা পর্য্যালোচনা করে' সমরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা ঠিক করেছেন যে একটা সেনাদলের শতকরা ২০জন হতাহত হলেই সে সেনাদলের আর moral থাকে না। তখন হয় নূতন সৈন্য এনে শূন্য স্থান ভরাতে হয়, নয় এই সৈন্য-দলকে পূর্ণ বিশ্রামদ্বারা শারীরিক ও নৈতিক ক্ষতিপূরণের জন্য (Physical and moral recuperation) পশ্চাতে পাঠিয়ে দিতে হয়। ঠিক এইরূপেই, আমার ধারণা যে, সমান শক্তিসম্পন্ন ও শিক্ষিত দুদলের মধ্যে শত করা ২০ বা ২৫ জনের ন্যূনতাও কোনক্রমে হৃদয়ের বল দিয়ে মেটান যায় কিন্তু তার অধিক হলে প্রতিভাও সত্যই সংখ্যার সামনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এই হিসাবে যেমন শতকরা কুড়িকে সেনাদলের moral limit করা হয়েছে, শতকরা পঁচিশকে সেইরূপ সেনাদলের moral compensation limit করা যেতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে "মার্ণ" যুদ্ধ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণরা সংখ্যার শক্তির উপর খুবই বিশ্বাস করেছিল। শিক্ষা, চরিত্র ও সরঞ্জাম (কামানাদি) এ-

(১) রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এইরূপে সংখ্যাধিক্য সকল প্রকার চরিত্র-বল, (discipline) ও অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব সত্বেও অত্যাচারী রাজার শিক্ষিত সৈন্যদলকে পরাজিত করতে পারে। অন্যান্য বিপ্লবের ন্যায় বিগত ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় জনসঙ্ঘ এইরূপে 'বাস্তিল' অধিকার করেছিল।

সবের শ্রেষ্ঠত্বের উপর সংখ্যার আধিক্য দিয়ে তারা ফরাসী সৈন্যকে তিন মাসের মধ্যে চেপে মেরে ফেলবে এইরূপ ঠিক করেছিল। কিন্তু "মার্ণে"র অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরাজয়ে যখন উভয়দিকে খাত কাটা হ'ল, তখন থেকেই উভয়দলে 'defensive-offensive' যুদ্ধরীতি অবলম্বন করলে। (১)

যখন একটা জমাট সৈন্যদল পতনশীল শিলাবৎ পাহাড়ের মাথা থেকে হুড়মুড় করে' নামে, তখন প্রথম প্রথম গোলা ও মেসিন-গানে তাদের অনেক মারা যায় বটে কিন্তু যখন তারা আটশ' গজের মধ্যে এসে পড়ে তখনই পদাতির বুক গুড়্ গুড়্ করতে থাকে। তারপর যখন সেই জমাট লোক-সংহতিটা হতাহত সত্বেও ভীমবেগে ছুটে আসে, তখন ক্রমান্বয়েই পদাতিককে বন্দুকের sight (angle) বদলাতে হয়। ৮০০-শ'র পর ৬০০শ' তারপর ৫০০শ' গজ, তারপর ৪০০শ'—এইরূপে প্রতিবার যখন sight বদলায় তখন তাদের হৃদয়ে বেশ একটা ছাপ পড়তে থাকে—যে ঐ পর্ব্বতচ্যুত শিলাখণ্ডটা এসে পড়ল বলে'। ৪০০শ' গজেতেও যদি ওটাকে ভেঙ্গে চুরমার করা না যায়, এবং যদি দেখা যায় যে তারা এখনও সংখ্যায় অধিক, তখন সত্যই লোকের পিছু ফিরে ছুট দিতে প্রবৃত্তি হয়। ঠিক এই সময়ে সেনানায়ক ও দুই একটি সৈন্যের ব্যক্তিগত হাবভাব, কথা ও সঙ্কল্প, বিষের মত অথবা অমৃতবৎ কাজ করে। কিন্তু এই সময়ে যদি সেনানায়ক দেখে যে ২৫০ গজের মধ্যে এসেও শত্রুরা সংখ্যায় দ্বিগুণ তখন তার মনের যে কি অবস্থা হয় তা বলা যায় না। সত্যই তখন পাষাণ-হৃদয়ও বিচলিত হয়ে পড়ে।

(১) খাতের লড়াই প্রসঙ্গে Counter attack করে' যে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে তাকেই defensive-offensive যুদ্ধনীতি বলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

—*—

জলে ও অন্তরীক্ষে

প্রথম অধ্যায়ে একটু আঁচ দেওয়া হয়েছিল যে বৃহদাকার অর্ণবপোত, জেপ্‌লিন অথবা হস্তী, রথ ও অশ্বের এখন আর তেমন কদর নেই। তার কারণ যুদ্ধটা আর আজকাল খোলাখুলি মাটির উপর দাঁড়িয়ে অথবা জলের উপর জাহাজ চালিয়ে কেউ করতে চায় না। যুদ্ধক্ষেত্রটা ক্রমশই অতলতলে ও মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হচ্ছে। এমনকি প্রকাশ্য আকাশমার্গেও লোক যুদ্ধ করতে নারাজ—আকাশযুদ্ধটাও তাই অন্ধকারে মেঘের আড়ালে অনুষ্ঠিত হতে আরম্ভ হয়েছে। এই যে লুকোবার এত প্রচেষ্টা, তার পিছনে মস্ত বড় একটা সত্য রয়েছে—সেটা হচ্ছে ভয়। ধ্বংস করবার এমন সঠিক ও অব্যর্থ যন্ত্র সব বার হয়েছে এবং কারখানায় এত বহুল পরিমাণে তার নির্ম্মাণ চলেছে, আর সেইগুলোকে ব্যবহার করতে পারদর্শী লোক আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার মধ্যে এত বেশী, যে সত্যই কারও হাজার জোর থাকলেও বুক ফুলিয়ে বিরাট বপুখানি দুলিয়ে চোখ রাঙিয়ে যাবার যো নেই। ৮।১০ কোটী টাকা দামের একটা ড্রেডনট্‌, একটা খুচরো (কলকাতার পোর্ট-কমিশনারের ছোট ফেরি ষ্টিমারের মত) টরপিডো-বোট থেকে একটী টরপিডোর আঘাতে ৫ মিনিটের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া যায়, অথবা তার সামনে একটা মোটর বোটে করে' গিয়ে একটী মাইন ফেলে দিয়ে আসতে পারলে স্পর্শমাত্র তার আর চিহ্ন থাকে না। একখানা

১৬।১৭ জন প্যাসেঞ্জার ও ২০ মণ বোমাধারী জেপ্‌লিন একটী মেসিনগানের বুলেটে ধোঁয়া হয়ে উড়ে যেতে পারে। লক্ষ লোক যদি একবার মাটির উপর উঠে দাঁড়ায় ত এক দণ্ডের মধ্যে তাদের শমন-ভবনে প্রেরণ করা যায়। হস্তী, অশ্ব, রথ-এর একটা শব্দ শুনলেই যখন স্থানটাকে একেবারে গোলায় গোলায় চষে ফেলা হয়, তখন আর বৃহদাকৃতি যান-বাহনের কি আবশ্যকতা আছে!

এইজন্যই বৃহদায়তন ড্রেডনট, খোলস ছেড়ে, সাবমেরিণ রূপে অতল তলে প্রবেশ করছে; হস্তী, অশ্ব, পদাতি তাড়াতাড়ি মাটির মধ্যে ঢুকে পড়ছে; আর সেদিনকার ভয়ঙ্কর জেপ্‌লিনও আত্মপ্রাণভয়ে ক্ষুদ্র বায়োপ্লেন রূপে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে। এ যুগের কথা বাদ দিলেও, তখনকার যুগে যদি কেউ একটা ব্রহ্মাস্ত্র তৈরি করে' ফেলতেন ত সেটা কোন ঋষির কাছেই গোপন থাকত। বিশেষ দরকার পড়লে তবে তাঁরা সেই মারাত্মক ও অব্যর্থ বৈজ্ঞানিক অস্ত্র কারু হাতে দিতেন। এবং একটা দৈত্য বা দুষ্ট রাজা বিনষ্ট হয়ে গেলেই যোদ্ধার কাছে আর ওরূপ অস্ত্র থাকত না। তখন আর কেউ ওরূপ অস্ত্র তৈরি করতেও জানত না, ব্যবহার করতেও জানত না, আর তৈরি করবার এত সুবিধেও ছিল না। কিন্তু আজকালকার ব্রহ্মাস্ত্র সকলেই তৈরি করতে পারে, তার জন্য হাজার হাজার কল কারখানা চলছে, এবং সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে প্রচুর পরিমাণে এইসব অব্যর্থ অস্ত্রশস্ত্র সামান্য সৈন্যের হাতেও এসে পড়েছে; তাছাড়া ঐসব যন্ত্র ব্যবহার করবার শিক্ষাটা ঋষি অথবা তাঁর ভক্তশিষ্যের মধ্যেই আবদ্ধ নেই পরন্তু শিক্ষার বিস্তারে দেশে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই এইসব যন্ত্র ব্যবহার করতে শিখচে। এইরূপে ধ্বংস করবার যন্ত্রগুলো সাংঘাতিক ও প্রচুর হয়ে পড়াতে লুকোনটা (কি

আক্রমণে, কি আত্মরক্ষায়) একান্তই দরকার হয়ে পড়েছে। তাই দুর্গাদির বদলে খাত ও সুড়ঙ্গ, ড্রেডনটের বদলে সাবমেরিণ, এবং জেপ্‌লিনের বদলে বায়োপ্লেনের অভ্যুত্থান। অতএব জলযুদ্ধে ড্রেডনটের কৃতিত্ব বর্ণনা না করে' সাবমেরিণের কথাই বেশী করে' বলব।

সাবমেরিণ

সাবমেরিণের অস্ত্র টরপিডো ও মাইন। কিন্তু এই অদৃশ্য ক্ষুদ্রকায় জাহাজখানি জলচর যানগুলির মনে এরূপ ভয়ের উদ্রেক করে যে বিগত যুদ্ধে একা সাবমেরিণের ভয়ে কোনো পক্ষেরই নৌবহর গর্ত্তের বার হতে পারে নি। এই সাবমেরিণ মিত্র পক্ষের এত জাহাজ মেরেছে ও নানাদিকে ভয় দেখিয়ে এত বাধা উৎপাদন করেছে যে কামান ছাড়া আর কোনো একটা armএ এত ক্ষতি করতে পারে নি।

একটা সাবমেরিণে একটি বা দুটি টরপিডো টিউব থাকে, এবং ২ হতে ৫।৬টি পর্য্যন্ত টরপিডো থাকে। তাছাড়া উপরে কামান, মেসিনগান এবং খোলের তলায় মাইন ও মাইন ফেলবার যন্ত্র আছে। ভাসা জাহাজেও টরপিডো টিউব থাকে। টিউবগুলি দেখতে সাধারণতঃ ৯ ইঞ্চি বা ১ ফুট জলের পাইপের মত। লম্বায় প্রায় ৮ হাত। মুখটা কলমছে করে' কাটা—তার ভেতর টরপিডো থাকে। টরপিডোগুলি ৫।৬ হাত লম্বা, কলাগাছের মত মোটা ; মুখটা মোচার মত সরু। তার পিছনে একটা ছোট মোটর থাকে। যখন টিউবে একটু বারুদ দিয়ে তার সামনে টরপিডোটিকে বসিয়ে ক্যাপ দিয়ে আওয়াজ করা হয়, তখন টরপিডোটি আপনার মেরুদণ্ডের উপর ঘুরতে ঘুরতে জলে লাফিয়ে পড়ে, আর অমনি সেই ঘোরার চোটে তার মোটর in action হয় অর্থাৎ

কার্য্য করতে আরম্ভ করে। এই মোটরের জোরেই, (টিউবের বারুদের জোরে নয়) টরপিডোটি ঠিক নাকের সিধে জলের ভেতর একটা "প্যারাবোলা" এঁকে জাহাজে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মেরে ঢোকে এবং তৎক্ষণাৎ তার অন্তরস্থিত বারুদ ফাটার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা displacement of air হয় যে তার চোটে জাহাজের তলায় ঘরের মত একটা গর্ত্ত হয়ে যায়। (১)

কিন্তু ভাসা জাহাজ, অর্থাৎ টরপিডোবোট, ডেসট্রয়ার, ক্রুজার আদি জাহাজের টরপিডো টিউবগুলির সঙ্গে সাবমেরিণের টিউবগুলির পার্থক্য এই যে, ভাসা জাহাজের টিউবগুলি ডাইনে বাঁয়ে ঘুরান যায়, কিন্তু ডুবো জাহাজের টিউবগুলি একেবারে খোলের সঙ্গে আঁটা। যে গর্ত্ত দিয়ে টরপিডোটা বার হয় তার মুখে একটা ভ্যাল্‌ব্‌ থাকে, পাছে সাবমেরিণে জল ঢোকে। ট্রিগার টানবার সময় ঐ ভ্যাল্‌ব্‌ খুলে যায় ও তৎক্ষণাৎ টরপিডোও বার হয়। তারপর ভ্যাল্‌ব্‌ আবার যথাস্থানে এসে জল আটক করে। টিউবের মুখটা কামানের মত ঘোরান যায় না বলে' সাবমেরিণটিকেই ঘুরে টিউবটিকে যথাযথ দিকে নির্দ্দেশ করতে হয়।

সাবমেরিণের গঠন অনেকটা পটলের মত। একটা ডিঙ্গির উপর আর একটা ডিঙ্গি উপুড় করে' চাপা দিলে ঠিক সাবমেরিণের মত দেখায়। তবে তার তলাটা জাহাজের মত "কোন" হয়ে গেছে, আর উপরটা মাঝখানে একটু চাপা। ঐ চাপা যায়গাটা একটা রেলিং দিয়ে

---

(১) টরপিডোতে অতি উচ্চ রকমের picrate বারুদ ব্যবহার করা হয়। Fuseএ fulminate of mercuryর detonator থাকে। মাইনে Gun cottonএর বারুদ ও nitro-glycerineএর detonator থাকে।

ঘেরা। ঐখানে পেরিস্কোপ বলে' একটা যন্ত্র থাকে। পেরিস্কোপটা দূর থেকে দেখতে বাঁশের খাদির মত, প্রায় ৫।৬ হাত লম্বা। ঐ যন্ত্রটি একটি ফাঁপা টিউব, তার উপরে "প্রিজম্" থাকে, নীচে "লেনস্"। তার তলায় টেবিলের উপর একটা ডিগ্রী আঁকা গোল আরসিতে বাইরের সব ছায়া পড়ে। ভাসমান অথবা অর্দ্ধ ভাসমান অবস্থায় সাবমেরিণ এইরূপে উপরের সব. চিত্র পরিদর্শন ও পথ নির্ণয় করে। কিন্তু মগ্নাবস্থায় ম্যাপ ও কম্পাসের সাহায্যেই গন্তব্য পথ ঠিক করে' নেয়।

ইউরোপীয় যুদ্ধ যখন প্রথম আরম্ভ হ'ল, তার অনেক পূর্ব্বেই সকলে জানতে পেরেছিল যে সবমেরিণ নৌযুদ্ধে একটা যুগান্তর আনয়ন করবে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের Lord of the Admirality, লর্ড ফিশার বলেছিলেন যে এই সাবমেরিণ নৌযুদ্ধে অভুতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধন করবে। এমন কি স্যার পারসি স্কট যুদ্ধের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে লিখেছিলেন যে সাবমেরিণের প্রভাবে ভাসা জাহাজ পৃথিবীতে আর থাকবে না।—কিন্তু তবুও এক জার্ম্মাণী ভিন্ন আর কেউ এই সাবমেরিণ বাড়াতে বেশী চেষ্টা করে' নি। তা'ও জার্ম্মাণী বড় বড় ড্রেডনট, ক্রুজার করতে যত টাকা খরচ করেছে, যুদ্ধ-পূর্ব্বে সাবমেরিণে যদি তা খরচ করত তা হ'লে ঐ এক বড়ে'র টিপেই যুদ্ধ জয় হ'ত। কিন্তু এরূপ না করার কারণ কি? এর একটা বেশ Psychological কারণ আছে। প্রথম কারণ:—theoritically ও ছোটখাট experiment করে' সাবমেরিণের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পেলেও বিশদ অভিজ্ঞতার মধ্যে সাবমেরিণের কৃতিত্ব না দেখা পর্য্যন্ত জার্ম্মাণিও ঐ সত্যটাকে সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করতে পারে নি। দ্বিতীয় কারণ:— বড় জাহাজের প্রতিপত্তিটা যে মিথ্যা তা তখনও প্রমাণিত হয় নি।

মনের এমনি নিয়ম যে সে হাজার বুঝলেও বিশদভাবে জগৎবক্ষে অপ্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি, আচার বা যন্ত্রাদিকেও সহজে ছাড়তে পারে না। এটাকেই আমরা বলি সংস্কার। তাই সকল জাতিই সাবমেরিণের আবশ্যকতা বুঝলেও তখনও চির-প্রতিষ্ঠিত ক্রুজার আদির মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সেইজন্য জার্ম্মাণি পর্য্যন্ত, এত Progressive হয়েও, কিছু সাবমেরিণ করে' অধিকাংশ অর্থই অনাবশ্যক বড় বড় জাহাজে ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছিল। এত সঁখের সেই জাহাজগুলোই এতদিন বন্দরে বসে থেকে থেকে, শেষে দলবেঁধে Scapa Flowতে এসে ডুবে মল। মানুষের মন যদি সংস্কারের হাত থেকে কতকটাও মুক্তি পেত তাহলে মানুষ যে কি হত তা বলা যায় না!

এখন কথা হচ্ছে সাবমেরিণ চলে কি রকম করে'। সাবমেরিণ পেট্রল মোটরে চলে। ৮০ ঘোড়ার জোর, দুটো থেকে চারটো পর্য্যন্ত মোটর এক একটা সাবমেরিণে থাকে। দুটো বা একটা মোটর কাজ করে, বাকিগুলো বসে' থাকে। যদি কোন ক্রমে চল্‌তি মোটর-গুলো বন্ধ হয়ে যায়, খারাপ হয় বা ভেঙ্গে যায়, তা'হলে এই বাড়তি মোটরগুলো সাবমেরিণটাকে বাঁচায়। কারণ জলের ভেতর প্রাণস্বরূপ মোটরগুলো খারাপ হয়ে গেলে যে কি অবস্থা হয় তা বর্ণনাতীত। একজন ছোকরা নাবিক-বন্ধুর একবার এইরকম অবস্থা হয়েছিল। তিনিই এই গল্পটি করেছিলেন। "তুলঁর নিকট তীরের কাছে এসে ভাসতে যাচ্ছি হঠাৎ আমাদের মোটর খারাপ হয়ে গেল। তখনি মিস্ত্রি লাগিয়ে সেটাকে সারবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু ঘণ্টা চারেক চেষ্টার পর বোঝা গেল যে ব্যাপারটা যত সামান্য মনে করা গেছল তা

মোটেই নয়, মোটরটা দস্তুরমত খারাপ হয়ে গেছে—বোধহয় "ডকে" না গেলে আর সারা যাবে না,. তবে মিস্ত্রিরা জলযোগের পর একবার শেষ চেষ্টা করে' দেখবে।—কথাটা শুনে আমাদের বুকটা আঁতকে উঠল! তোমরা এই শুনে হাসছ, আমায় হয় ত ভীরু মনে করচ। কিন্তু জলে ডুবে তিলে তিলে নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে চোখের সামনে জ্যান্ত বন্ধু বান্ধবকে দম আটকে মরতে দেখা যে কি মর্ম্মান্তিক, তা যদি তোমরা জানতে, তা হলে হাসতেও না আর আমাকে ভীরুও মনে করতে না। কিন্তু যাক্। ১৫ মিনিট পরে মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টা বাজল। ভাঁড়ারী যথা নিয়মে আমাদের শুকনো বিসকুট আর ঠাণ্ডা ঘোড়ার মাংস দিয়ে গেল। কিন্তু মাংস আর কারুর মুখে উঠলো না। কেউ এক গাল খেলে কি না খেলে। কাপ্তেন ত জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করলেন না। তিনি মাটীর দিকে চেয়ে কি ভাবছিলেন। আমরা মুখের দিকে চাইতেই তিনি তৎক্ষণাৎ চমকিতের ন্যায় উঠে দাঁড়ালেন। ক্ষণেক পরেই বংশীধ্বনি শুনে আমরা তাঁর চতুর্দ্দিকে সমবেত হলুম। তিনি তখন করুণ অথচ দৃঢ় স্বরে বললেন—যা বললেন সে কথার আর দরকার নেই, তবে তার মোটামুটী ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, 'খুব সম্ভবতঃ মোটর সারা যাবে না। যদিও আমরা বন্দর থেকে এক হাজার গজ মাত্র দূরে আছি তবুও এই হাজার গজ আজ হাজার মাইল। জোয়ারের ঠেলায় হয়ত ইঞ্চি ইঞ্চি করে' ৮।১০ দিনে জাহাজটা কিনারায় পৌছোতে পারে কিন্তু তার বহু পূর্ব্বেই আমাদের একজনও জীবিত থাকবে না—কারণ হাওয়ার 'জারে' মাত্র ৪।৬ ঘণ্টার মত হাওয়া আছে। যদি আমরা জলের উপর থাকতুম তা হলে অনেকেই এর বহুগুণ ব্যবধান সাঁতরে অতিক্রম করে' তীরে পৌছোতে পারতুম; কিন্তু সে আশা একদমই নেই তা আর

কি হবে! তবে একটু মাত্র আশা আছে। হাওয়া পোরবার ছোট মোটরটা এখনও আছে। ঐটাকে যদি কোন ক্রমে ট্যাঙ্কের জল-বার-করা কলটার সঙ্গে যোগ করে', আমাদের জাহাজের ভেতরকার হাওয়া পাম্প করে' শুষে নিয়ে তার চাপে যদি কয়েকটা ট্যাঙ্ক খালি করে' ফেলা যায় তাহলে জাহাজটা ভেসে উঠতে পারে। কিন্তু এই সামান্য হাওয়া এই কাজের জন্য যথেষ্ট হলেও হাওয়ার অভাবে জাহাজ ভাসবার পূর্ব্বেই যে আমরা সকলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হব না তার কোন স্থিরতা নেই। তবে যাই হ'ক এই শেষ উপায়। অতএব সকলে যে যার স্থানে বসে' থাকুক। একটুও যেন না নড়ে। গায়ের জামা পায়ের জুতো-মোজা সব খুলে ফেলা হ'ক যেন একটুও না গরম হয়। হাতের কাছে সকলে ভিজে রুমাল রাখুক, বেশী গরম বোধ হলে মুখ ও ঘাড় রুমাল দিয়ে মুছবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।' এই বলে' কাপ্তেন ক্ষান্ত হলেন। আমরা তখন মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যথাযথ আজ্ঞা প্রতিপালনে মনোযোগ দিলুম। কিন্তু আমাদের বাঁচবার আশা যে মাঝে মাঝে মনে অস্পষ্ট রশ্মি রেখা টানছিল না তা নয়।—তখন জাহাজটা ৫০ গজ জলের নীচে পাহাড়ের গায়ে লঙ্গর করে' ঝুঁকে বসেছে।

"এমন সময় একটা বংশীধ্বনি শোনা গেল। জাহাজের সব চোখগুলো তখন কাপ্তেনের দিকে। তাঁর শরীর অর্দ্ধ-উলঙ্গ। কটিদেশে মাত্র একটি হাফপ্যান্টে ঢাকা। শান্ত মুখমণ্ডলে অসীম দৃঢ়তা লুকিয়ে রেখে তিনি বাম হাতে হাল ধরেছেন।—যেন সাক্ষাৎ শক্তিমূর্ত্তি! ভট্ ভট্ ভট্ মোটর চলতে আরম্ভ করল। শোঁ শোঁ শোঁ করে' জাহাজের হাওয়া শুষতে লাগল। আমরা তখন জীবন-মরণের মাঝে এক নতুন জগতে গিয়ে বসলুম!—কিন্তু ৫ মিনিটের মধ্যেই সব হাওয়া

নিঃশেষ হয়ে এল, লোকে আই ঢাই করতে লাগল। কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিলে, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। জল কতকটা বার হল বটে কিন্তু জাহাজ একটুও নড়ল না। তখন কাপ্তেন আজ্ঞা করলেন 'জারের হাওয়া ছাড়।' তখনি শত টিউব থেকে নির্ম্মল বায়ু আমাদের অমৃতস্পর্শ দিয়ে বয়ে গেল। আবার ভট্ ভট্ ভট্ শোঁ—মোটর ছুটল, হাওয়া শুষতে লাগল। ক্রমে আবার সেই গ্রীষ্মানুভূতি, আবার স্বেদবিন্দুতে কপোল ও ললাটদেশ আবৃত হল। মোটর তবুও থামল না। প্রাণপণে তখন মোটরে মিস্ত্রিরা জোর দিলে। নিমিষের মধ্যে বায়ু ফুরিয়ে এল। লোকের চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। ১০৬ ডিগ্রি জ্বরের মত বুক দুড় দুড় করতে লাগল। কাপ্তেন কোন দিকেই চাইলেন না। এক হাতে হাল ধরে' এক হাত জাহাজের গায়ে চেপে ধরে যেন ঐকান্তিক ভাবে কি একটার অনুভূতি অপেক্ষা করছিলেন। কেবল একবার চোখ ফিরে এক সাপটে সকলের অবস্থা দেখে নেবার সময় ইঙ্গিতে জানালেন মুখে চোখে জল দাও।

"কিন্তু জল দেবে কে ? বহু পূর্ব্বেই রুমালের জল সব বার হয়ে গেছে। এখনও যা একটু আছে তা নেঙড়াবার সামর্থ কৈ ? হয়ত হাওয়া করলে কতকটা প্রাণ জুড়োয় কিন্তু হাত নাড়লে বুকের প্যাল-পিটেশন (palpitation) বাড়বে! উঠে যে জল আনব তার সামর্থ্যও তখন লোপ পেয়েছে।

"এমন সময় ধড়াস্ করে' একটা শব্দ হল। সকলে শব্দকে লক্ষ্য করে' চোখ ফেরালে। একজন নাবিক মূর্চ্ছা গেছে। সকলে আবার সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে। এক মিনিটও অতিক্রান্ত হয়নি আবার সেই শব্দ—আবার একজন মূর্চ্ছাগত! লোকে তার দিকে

একবার চেয়ে তখনি চোখ ফিরিয়ে নিলে। তারপর চারধারে ধুপধাপ সব লাস পড়তে লাগল। কে কার দিকে চায়!

"হঠাৎ একটা লাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটা দুলে উঠল—মাথার উপরের লোহার চাদরের ছাতাটা মড়মড় করল। যারা বেঁচে ছিল তারা একটা অস্ফুট করুণ নিনাদ করে' উঠল। কিন্তু তখনই কাপ্তেন লাফিয়ে উঠে দু হাতে চাকা ধরে' হাল ঘুরিয়ে দিতে দিতে চীৎকার করে' উঠলেন—"আমরা উঠছি!" তখন চারিদিকে মহা কোলাহল পড়ে' গেল। এই যারা পূর্ব্বমূহুর্ত্তেই মূর্চ্ছা ও মৃত্যুকে বুকে চড়ে' বসতে দেখছিল তারা তখন মাথা খাড়া করে' উঠে বসল। কোথা থেকে তাদের হাতের কব্জাতে জোর এল। তারা তখনি রুমাল নিঙড়ে মুখে চোখে জল দিলে। সেই মৃত্যু-বিভীষিকাগ্রস্থ মলিন অধরে আবার হাসির রেখা ফুটে উঠল। চোখে আশার আলো দেখা দিলে। কেউ ভগবানকে, কেউ ভাগ্যকে ধন্তবাদ দিতে লাগল। যারা পাশাপাশি ছিল তারা করমর্দ্দন করলে।

"এতক্ষণ আমরা এমন মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিলুম যে এই জ্যান্ত কবরের নিস্তব্ধতার মধ্যেও মোটর চলছে কিনা শুনতে পাইনি। খেয়াল হতে দেখলুম দুজন মোটরিষ্ট ডেকের উপর পড়ে আছে। একজন নিঃশব্দে মোটরের চাকা ধরে' একদৃষ্টে কাপ্তেনের ঠোঁট ও চক্ষু দুটীর দিকে চেয়ে আছে। তার চোখ দুটো যেন চিত্রপটে আঁকা।

"কিন্তু সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড ভেতরের হাওয়া আরও পাতলা হয়ে আসতে লাগল। কয়েক সেকেণ্ড পরে আশার আলোক চাপা দিয়ে আবার সেই মরণ যন্ত্রণা ফিরে এল। আর থাকা যায় না। আর

পারা যায় না। এই ৫০ গজ জল ঠেলে আপনা আপনি ভেসে উঠবার পূর্ব্বেই হয়ত আমাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হবে। আর কষ্ট সহ্য হয় না! যারা বেঁচেছিল একে একে তারাও মূর্চ্ছাগত হল। চারিদিকে মৃত্যুর ছায়া, শবের তেজহীন বিস্ফারিত চক্ষু, জীবিতের মৃত্যুশ্বাস—নিদারুণ গ্রীষ্ম—আর বুঝি প্রাণ বাঁচে না! ঠিক এমন সময় শেষে মোটরিষ্ট চাকার উপর ঝুঁকে পড়ল। "মেট্" তার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। ধীরে ধীরে মৃত দেহটাকে অপসৃত করে' তিনি মোটরের চাকায় হাত দিলেন।

"এদিকে হঠাৎ পেরিস্কোপ তুলে,' নিরীক্ষণ করে' কাপ্তেন, দৃঢ়স্বরে বলে' উঠলেন—Umpeu de courage, mes amis! Cinq metres. ভাই সব আর একটু থাক—৫গজ আছে! তারপর আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম।

"যখন জ্ঞান হল তখন দেখলুম আমি একটা হাসপাতালে শুয়ে আছি। আমার চারদিকে পাঁচ-ছজন স্ত্রী-পুরুষ আস্তেন গুটিয়ে কি কি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম। তারপর আমি এই তোমাদের সঙ্গে গল্প করবার জন্যে বেঁচে এসেছি বটে, কিন্তু সেই বীরহৃদয়, পিতৃপ্রতিম কাপ্তেনের সঙ্গে আর আমার ইহজীবনে দেখা হয় নি।"

তাই বলছিলুম, জলের ভেতর প্রাণ-স্বরূপ মোটর খারাপ হয়ে গেলে যে কি অবস্থা হয় তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এইরূপ বিপদপাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে এই auxiliary motor বা বাড়তি মোটরের প্রচলন! "বৃতানীর" এক বন্দরে যুদ্ধারম্ভকালে একটা

সাবমেরিণ কল খারাপ হয়ে ডুবে যায়। বন্দরের অন্যান্য লোকে একথা তখনি অ্যাড্‌মিরালের কাছে বলে' পাঠায়। সেইক্ষণেই ডুবুরি নামিয়ে চারদিন ধরে' সাবমেরিণের তলায় পাহাড়ের উপর দিয়ে গর্ত্ত করে' 'চেন' চালিয়ে জাহাজটাকে বাঁধা হয়। প্রতিদিন যখন ডুবুরি নামত, তারা সাবমেরিণটার গায়ে হাতুড়ির ঘা দিত এবং প্রতিদিনই ভিতর হতে ঘা দিয়ে ভেতরের লোকেরা 'বেঁচে আছি' জানাত। শেষে পঞ্চম দিবসে, জাহাজটাকে ক্রেণে করে' তোলা হল। কিন্তু লোকগুলির এমনি দুর্ভাগ্য যে উপরে উঠে চেনছিঁড়ে সাবমেরিণটা আবার জলে পড়ে' গেল। তারপর আরও দুদিন ভিতরের নাবিকেরা কেউ কেউ বেঁচে ছিল। কিন্তু যখন সত্যই জাহাজটাকে 'ডকে' তোলা হল তখন গলিত শব ভিন্ন জীবনের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না।

উপরের দুটো সাবমেরিণেই বাড়তি মোটর ছিল না। যুদ্ধের সময় এরূপ নিদারুণ দুর্ঘটনা যে কত ঘটেছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

সাবমেরিণ জাহাজটা যতই মারাত্মক বা ভীতিপ্রদ হ'ক, জিনিষটা আসলে অর্থাৎ নিজে, আদৌ কায়েমী নয়। খুব সরু লোহার চাদরে তৈরি। একটা কিছুতেই ঠেকলেই তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হয়ে যায়। অনেক সময় যুদ্ধকালে ছোট ছোট জাহাজ সাবমেরিণকে দেখে, কতকটা প্রাণ ভয়ে কতকটা প্রতিহিংসা বশে ছুটে গিয়ে তার ঘাড়ে পড়েছে আর সাবমেরিণ দুআধখানা হয়ে গেছে। তা ছাড়া একটা গোলা, কি sea planeএর বোমা লাগলে ত তার চিহ্নই পাওয়া যায় না। আর একটা বীভৎস ব্যাপার হচ্ছে এই যে জাহাজ ডুবলে বরং পরিত্রাণ আছে, অন্ততঃ বাঁচতে চেষ্টা করে' দেখা যেতে

পারে, কিন্তু জলের মধ্যে সাবমেরিণ ভাঙলে আর উঠবার কোন আশাই থাকে না। সকল প্রকার মরণের চাইতে মগ্নপ্রায় জাহাজের ঘুর্ণির মধ্যে পড়ে' ডুবে মরা অতীব বীভৎস। আমরা নিজের চক্ষে দেখেছি আমাদের জাহাজটা টরপিডো হতে, জাহাজটা সামনে প্রায় ৪০ হাত কেটে বেরিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ৪০০।৫০০ জন লোককে সমুদ্র যেন হাঁ করে' গিলে নিলে। শোনা যায় যে জাহাজ ডোববার সময় জল ফাঁক হয়ে ঘুরতে ঘুরতে তলা পর্য্যন্ত যায় এবং যতকিছু মানুষ ইত্যাদি সব টেনে নিয়ে গিয়ে একেবারে তলায় ফেলে। তারপর যখন চার ধারের জল এসে গর্ত্ত চাপ করে তখন আস্তো আস্তো বুকগুলো মানুষের, মড় মড় করে' ভেঙ্গে যায়। আমরা স্বচক্ষে কখন এরকম শব দেখিনি কিন্তু এটা হওয়াই স্বাভাবিক। মহাকবি সেক্সপিয়র 'টেম্পেষ্ট' নাটকে নৌকোডুবির দৃশ্যে, সভাসদ গন্‌জেলোর মুখ দিয়ে বলেছেন—"The wills above be done! but I would fain die a dry death.—ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক! কিন্তু এর চেয়ে ডাঙ্গায় মরলে আমি ঢের সুখী হতুম!" তবুও তখন কবিরা সাবমেরিণে দম আটকে মরার সুখের কথা শোনেন নি!

সাবমেরিণ এই রকমে মোটরের জোরে চলে। কিন্তু ডুববার ও ভাসবার জন্যে জাহাজের তলায় জলের ট্যাঙ্ক থাকে। সাধারণ ভাসা জাহাজে, খোলের তলায়, যেমন ballast দেয়, তেমনি সাবমেরিণে থাকে জলের ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্কের সঙ্গে জলের পাইপ থাকে—সেগুলোর একমুখ ট্যাঙ্কে অপরমুখ জাহাজের গায়ে। পাইপের মুখ খুলে দিলেই ভর্ ভর্ করে' জাহাজের ট্যাঙ্কে জল ঢোকে ও সাবমেরিণ সেই ভারে

ডুবে যায়। ঐ জল বা'র করতে হলে মোটর দিয়ে পাম্প করতে হয়। কাজেই সাবমেরিণের ডুবতে বা উঠতে একটু সময় লাগে। তবে একটু জল বার হয়ে গেলেই মোটরের জোরে সাবমেরিণ উপরে ওঠে।

লড়ায়ের প্রথমে, মাল জাহাজে বা প্যাসেঞ্জারী জাহাজে কামান ছিল না। তাই প্রথম প্রথম জার্ম্মাণ সাবমেরিণ উপরে পেরিস্কোপ তুলে' টরপিডো করত। তারপর ভেসে উঠে দূর থেকে মজা দেখত। এমন কি কোন কোন সাবমেরিণ ভগ্ন জাহাজের life-boat ইংলণ্ডের কিনারার কাছ পর্য্যন্ত টেনে দিয়ে গেছে। তারপর কখন কখন এমনও হয়েছে, যে টরপিডো করে' তারপর ভেসে উঠে সাবমেরিণ কামানের গোলায় ও মেসিন গানের গুলিতে, লোকসমেত নৌকাদি ধ্বংস করেছে—কেউ যাতে এই ঘটনার বার্ত্তা নিয়ে না দেশে যেতে পারে।—আপনার অবস্থিতি গোপন রাখবার জন্যেই অনেক সাবমেরিণ এরূপ নির্ম্মম সাবধানতা গ্রহণ করত।

তারপর প্রতি সমুদ্রগামী জাহাজে কামান চড়ল। কিন্তু সাব-মেরিণেরও উপদ্রব বাড়ল। তখন সকাল সন্ধ্যায় সাবমেরিণ টরপিডো চালাতে লাগল। Camouflage gas, বহরে বহরে যাতায়াত, লাইন পরিবর্ত্তন, Sea planeএর সমুদ্ররক্ষণ প্রভৃতি কত উপায়ই তখন অবলম্বিত হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। দিন দিন সাবমেরিণের উপদ্রব বাড়তেই লাগল।

যে সব জার্ম্মাণ সাবমেরিণ জাহাজ টরপিডো করে' বেড়াত তাদের মধ্যে দুটি বিশিষ্ট বিভাগ ছিল। প্রথম বিভাগের সাবমেরিণ ২।৩টি করে' দল বেঁধে শত্রুর প্রত্যেক বন্দর ঘিরে রাখত এবং দ্বিতীয়

বিভাগ (দল বেঁধে বা একাকী) জাহাজের লাইন ধরে' ধরে' ঘুরত যদি ভাগ্যক্রমে রাস্তায় কোন জাহাজাকে দেখতে পায়। পোর্টে ঢুকে পাছে সাবমেরিণ বাঁধা জাহাজ সব টরপিডো করে' যায়, সেইজন্ত প্রত্যেক পোর্টকে মিত্রশক্তি নারিকেল দড়ির মত মোটা গ্যালভ্যানাইজ্‌ড্‌ তারের জাল দিয়ে ঘিরে রাখতেন। এই জাল প্রত্যহ সকাল ৬টার সময় একটা ষ্টিমার দিয়ে টেনে একটু ফাঁক করে' দেওয়া হ'ত, এবং সন্ধ্যা ৬টার সময় তোপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জাল টেনে এনে পোর্টকে ঘিরে ফেলা হ'ত। এই ৬টা থেকে ৬টা অর্থাৎ সারা দিন বন্দরে জাহাজ যাতায়াত করত। রাত্রে একটা নৌকো পর্য্যন্ত বার হবার যো ছিল না। তা ছাড়া সমুদ্রগর্ভে যথেষ্ট ভাসা ও ডুবো মাইন থাকত —যাতে ঠেকলেই সাবমেরিণ চূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু এত ঘেরা সত্বেও, আমাদের চোখের সামনে, পরিষ্কার দিনের বেলা, ১২টার সময়, একদিন পোর্টের ভেতর ঢুকে একটা সাবমেরিণ 'পলিনেজিয়ান' জাহাজকে মাণ্টা বন্দরে, টর্পিডো করে' গেল।

সেইকারণে আরও সতর্ক হবার জন্ত বন্দরে বন্দরে বহুতর Sea-plane রাখা হ'ত। Sea plane, aero-planeএরই মত; কেবল তার খোলটা নৌকোর ন্তায়। এই Sea-plane জলে পড়লে ভাসে এবং মোটর চালিয়ে পাখা ঘুরিয়ে সামনের হাওয়া কেটে সমুদ্রে ষ্টীমারের বেগে ছুটতে পারে। এই সব Sea-plane পালা করে' বন্দরের সামনে সমুদ্রে ৫।৬ মাইল পর্য্যন্ত পাহারা দিত। সকলই জানেন সমুদ্রের জল অতি স্বচ্ছ। তার ভিতর সাবমেরিণ থাকলে উপরে sea-plane থেকে স্পষ্ট তাকে দেখতে পাওয়া যায় এবং তখন pilot ঠিক সাবমেরিণটার উপরে এসে উপর থেকে গর্ত্ত দিয়ে একটা বোমা ছেড়ে

দেয়। এইরূপ অনেক বোমাই Sea-planeএর ভিতর থাকে। বোমা-গুলি সর্ব্বসুদ্ধ আড়াই হাত লম্বা। মুখটা মোচার মত, পিছন দিকটা কাঁদির ডাঁটার মত সরু হয়ে গেছে। তার গায়ে মোচড়ান পাখা। ঠিক যেমন তীরের গতিটাকে সোজা রাখার জন্য তীর-কাঠিটাতে পালক বাঁধে, হাওয়ায় বোমারও দিক ঠিক রাখবার জন্যে ৪ খানা পালকের মতই মোচড়ান পাখা থাকে। এই বোমাটা যদি জলে পড়ে গেল ত কথাই নেই। কিন্তু যদি এটা সাবমেরিণের গায়ে ঠেকে তা' হ'লে আর তার নিস্তার নেই। কিন্তু এত পাহারা সত্ত্বেও এক একটা সাবমেরিণ বন্দরের ধারে পাহাড়ের আড়ালে জলের ভেতর এমনি লুকিয়ে থাকৃত যে সহজে তাকে চিনে উঠতে পারা যেত না। এ ছাড়া প্রত্যেক জাহাজ বা জাহাজ-বহর যখন বার হ'ত তখন এই সব Sea-plane বহুদূর পর্য্যন্ত তাদের উপরে উড়তে উড়তে এগিয়ে দিয়ে আসত। কিন্তু এ কাজের জন্য বহুতর Hydroplaneই ব্যবহৃত হ'ত। Hydroplane অর্দ্ধেক বেলুন এবং অর্দ্ধেক Sea-plane। বেলুনে বা ফানুসে Hydrogen বা অন্য কোন বায়বীয় পদার্থ থাকে যার জোরেই সেটা ভাসে এবং মোটর ও heliceএর জোরে চলে। এসব কথা পরে ভাল করেই বলা হবে। এই হাইড্রোপ্লেনে একটা বেলুন থাকে বলে' সেটা খুব বেশীক্ষণ উড়তে পারে—তাই অনেক দূর যেতেও পারে। এইরূপে Sea-plane ও Hydroplane যখনি জাহাজ আসত বা যেত তাদের সঙ্গে করে' দূর থেকে নিয়ে বা দূরে দিয়ে আসত। তা ছাড়া Hydroplane বহু দূর, ৫০ মাইল পর্য্যন্ত বন্দরের চারিদিক পালা করে' পাহারা দিত।

এই সাবমেরিণের হাত থেকে পার পাবার জন্যে প্রত্যেক জাহাজে

বড় বড় লোহার টিউবে (যেমন সব টিউবে বটকৃষ্ণ পালের দোকানে অক্‌সিজেন গ্যাস বিক্রী হয়)—camouflage gas থাকে। যদি কোন রকমে—নিকটস্থ কোন জাহাজের কাছ থেকে বেতার যন্ত্রে সংবাদ পেয়েই হ'ক, কিম্বা মাস্তুলের উপর থেকে দেখেই হ'ক—জানা যায় যে নিকটে সাবমেরিণ আছে, তখনি "রেঞ্চ" দিয়ে টিউবের মুখগুলো একটু আলগা করে' দেওয়া হয়, আর তা থেকে কুয়াসার মত এক রকম বায়বীয় পদার্থ বার হয়ে জাহাজটাকে ঢেকে ফেলে। অবশ্য এ গ্যাসটা সীমান্তের বিষাক্ত গ্যাসের মত মারাত্মক অথবা ক্ষতি কারক নয়। যাহ'ক এই রকম গ্যাস ছাড়লে সাবমেরিণ বুঝতে পারে না উপরে কোন জাহাজ আছে কিনা এবং বুঝতে পারলেও ঠিক কোন্ যায়গায় জাহাজটা আছে তা ঠিক করতে পারে না—তাই সাহস করে' টরপিডোও ছাড়তে পারে না। এইরূপে কিছু দূর রাস্তা পার হলে পর, যখন বোঝা যায় বা সংবাদ পাওয়া যায় যে সাবমেরিণটা অন্যদিকে গেছে, তখন গ্যাস-টিউবের ছিপিগুলো আবার "রেঞ্চ" দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়।

অনেক সময় সাবমেরিণকে কাছে পেলে, ডেষ্ট্রয়ার বা ক্রুজার থেকে একটা "Basket-bomb" ফেলে দেওয়া হয়। এই বোমাগুলো এক একটা পিপের মত। ডাইনে বাঁয়ে দুখানা ছোট চাকা দিয়ে খাড়া করে', এই পিপারূপ বোমাটাকে, parallel-barsএর হাতার মত শূন্য মার্গস্থ দুটো horizontal railএর উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই বোমাটার পিছনে একটা শক্তিশালী স্প্রীং থাকে, কিন্তু কলের জোরে এই পিপারূপ বোমাটাকে পিছনে ঠেলে স্প্রীং চেপে, সেইরূপ অবস্থায়ই ছিটকিনি দিয়ে তাটকে রাখা হয়। তারপর যখন দেখা যায় একটা

সাবমেরিণ খুব কাছে এসে পড়েছে তখন জাহাজটাকে ঘুরিয়ে সেই বোমাটা সাবমেরিণের দিকে আসবামাত্র তার ছিটকানি টেনে নেওয়া হয়, আর অমনি স্প্রীং'এর জোরে সেটা জাহাজ থেকে কিছু দূরে লাফিয়ে পড়ে' ফাটে, এবং জল এত তোলপাড় করে' তোলে যে তাতে ক্ষুদ্র সাবমেরিণ নিজের গতি ঠিক রাখতে না পেরে ভেসে ওঠে। তখন তাকে পাকড়াও করা ডেষ্ট্রয়ারের পক্ষে বেশী শক্ত হয় না। মাণ্টা বন্দরে যখন জাহাজ ডুবি হয়ে আমরা অপেক্ষা করছিলুম, তখন পূর্ব্ব-কথিত "পলিনেজিয়ান" জাহাজকে যে জার্ম্মাণ সাবমেরিণটা "ডকে" ঢুকে টরপিডো করে, তাকে একজন ছোকরা, ফরাসী ডেষ্ট্রয়ারের কাপ্তেন, তিন দিন পরেই এইরূপে একটা Basket-bomb ফেলে ধরে' ফেলে।

এ সব ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কতশত সাবধানতা ও কৌশল অবলম্বিত হ'ত।—যেমন জাহাজের উপর রাত্রে একেবারে আলো জ্বালা বন্ধ থাকত। এবং যদি কোন কেবিনে একান্ত আলোর দরকার হ'ত ত সব জানালা দরজা বন্ধ করে' তবে আলো জ্বালা হ'ত। তা'ও প্রত্যেক কাঁচের সারসিতে মোটা নীল কাগজ মারা থাকত। কারণ কোনক্রমে ছাঁদা দিয়ে একটু আলো বার হয়ে পড়লেও আলোটা নীল হয়েই বার হবে, এবং তাতে কোন ক্ষতি হবে না, কারণ periscopeএ, শুধু periscope কেন শুধু চোখেও, দূর থেকে নীল সমুদ্রে, নীল আকাশের তলে, নীল আলো লক্ষ্য করা যায় না। ঠিক এই কারণেই প্রথম প্রথম সব জাহাজকে নীল রং করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর আরও ভাল করে' আত্মগোপন করবার জন্যে, prism'এ সাতটা রং যেমন করে' ছিট্ ছিট্ হয়ে ভেঙ্গে যায়, ঠিক সেই অনুপাতে

ও সেই অনুসারে জাহাজ সব রং করা হত। দেশলাই রাত্রে একেবারেই জ্বালতে দেওয়া হত না। কারণ সাবমেরিণ অধিকাংশ সময় গুপ্তচর মুখে খবর পেয়ে জাহাজের লাইনে ঘুরতে ঘুরতে জাহাজটাকে দেখতে পেলেও সহজে দিনের বেলায় টরপিডো করে না, দূরে দূরে তার অনুসরণ করে; কিন্তু রাত্রে লক্ষ্য হারাবার ভয়ে তার নিকটে থেকেই তা'র পাছু পাছু ছোটে; তারপর ভোরের আলো দেখা দেবামাত্র, অর্থাৎ যেই periscope-এর prism এ ছবি উঠে, অমনি বেচারা জাহাজের গায়ে টরপিডো হাঁকড়ায়। কিন্তু এরূপ অবস্থায় রাত্রে নিকটে থাকতে থাকতেই যদি সাবমেরিণ হঠাৎ আলো দেখে ত তখন লক্ষ্য স্থির করে' টরপেডো করতে পারে; এই ভয়ে আলো, বিশেষতঃ দেশলাই জ্বালতে নিষেধ ছিল। তা ছাড়া অনেক সময় জাহাজের লাইনে শিকারের সন্ধানে অর্দ্ধভাসমান অবস্থায় ঘুরবার সময় বা উপরে উঠে নির্ম্মল বায়ু "জারে" ভরে' নেবার সময়, যদি কোন সাবমেরিণ হঠাৎ সমুদ্রে আলো জ্বলতে দেখে ত তখনি সে ঠিক করে' নেয় যে নিকট দিয়েই কোন জাহাজ যাচ্ছে, ও সে তার অনুসরণ করে। অন্য আলোর চাইতে দেশলাই জ্বালার আলো সমুদ্রে অনেক দূর হ'তে দেখতে পাওয়া যায়—কারণ এ আলোটা হঠাৎ জ্বলে ওঠে এবং সেইজন্য চোখের স্নায়ুর উপর বেশী আঘাত করে' বলে' সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সব বিবিধ কারণে ডেকের উপর দেশলাই জ্বালা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এত বিপদাশঙ্কা ও নিষেধ সত্ত্বেও যদি কোন লোক সিগারেট খাবার লোভ সামলাতে না পেরে, ঘরের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে দেশলাই জ্বেলে ফেলত, ত তাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করে' মেরে ফেলবার খোলা হুকুম ছিল।

জাহাজ থেকে এক টুকরো কাগজ পর্য্যন্ত জলে ফেলবার হুকুম ছিল না। কারণ কাগজ বা অন্য কিছু সমুদ্রের মাঝে ভেসে যেতে দেখলেই সাবমেরিণ বুঝতে পারবে যে নিকটেই কোন জাহাজ আছে। সেইজন্য ভোর তিনটের সময় জাহাজের ডেক ও কেবিন ধুয়ে মুছে, তারপর লাইন পরিবর্ত্তন করে' প্রত্যহ যাতায়াত করা হ'ত।

এ সব ছাড়া দিবারাত্র মাস্তুল ও চতুষ্পার্শ্বের লোকেরা দুর্ব্বিন নিয়ে পাহারা দিত—কোথায় কখন একটা টরপিডো আসবার "জল-রেখা" দৃষ্টিগোচর হয়, কোথায় বা একটা সাবমেরিণ ভেসে ওঠে!

যতরূপ precaution নেওয়া যায় তা নেওয়া সত্বেও যখন দিন দিন টরপিডো করা বাড়তে লাগল তখন কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে জাহাজের গড়নটা বদলাবার দিকে মন দিলেন। আমরা একদিন ফ্রান্সের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে St. Miheal সহরের কাছে প্রেসিডেণ্ট পয়কারের জমীদারীভুক্ত Tombois নামক বনের এক dug-outএ সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া শেষ করে' বসে কথা কচ্ছি। কথায় কথায় যুদ্ধক্ষেত্রে যতরকম যন্ত্রের ও তন্ত্রের অপূর্ণতা আছে সে সব ত্রুটি কি রকম করে' মেটাতে পারা যায় সেই কথা উঠল। কেউ বল্লে, আমি এমন একটা কামান করব যেটা মিনিটে হাজারটা গোলা ছুঁড়বে আর Automatic deboucheur হবে। তখনি তার ঠেঙ্গে তার কামানটার plan নেওয়া হল। সে মোটামুটি Hotchkiss machine Gunএর planটা একটু বদলে সদলে বল্লে। কেউ বল্লে, আমি এমন একটা কামান করব যার আগুন দেখা যাবে না—কারণ এইরূপ আলো দেখেই রাত্রে শত্রু কামানের অবস্থিতি নির্ণয় করে। তখন তাকে তার মতলবটা ব্যাখ্যা করতে বলা হল—কিন্তু নানারূপ যন্ত্রতন্ত্রের আবিষ্কার করা সত্বেও শেষে দেখা গেল

যে আলো দেখা যাবেই—কারণ গোলাটা বার হবার আগেই আলো বার হয়, তাই আলোকে চাপা দিতে গেলে গোলাও চাপা পড়ে যায় !—অতএব তার planটার গোড়ায় গলদ র'য়ে গেল। আবার একজন বল্লে যে সে এমন একটা কামান করবে যেটা জুটমিলের চিমনির একশ গুণ লম্বা ও চওড়া হবে, সেটাকে সে ভার্দ্দুন পর্ব্বতে নিয়ে গিয়ে বসাবে, আর একটা দড়ি দিয়ে কর্মেসি থেকে তার ট্রিগারটা টানবে—এবং সেই গোলাটা রাস্তায় কোথাও না থেমে, একেবারে ক্রুপের কারখানায় গিয়ে পড়বে এবং সেই গোলাটা হবে এত বড় এবং সাংঘাতিক যে সেই এক গোলার দমকেই কারখানাটা মাটির নীচে ডুবে যাবে—যেটা হলে আমাদের আর ফ্রান্সের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধটুদ্ধ কিছুই করতে হবে না ! এইরূপে কত লোকে কত সত্য ও আজগুবি কথাই বল্লে। শেষে আমাদের মধ্যে একটি বোকা ছিল—অবশ্য বোকা আমরা তাকে বলতুম যদিও সে নিশ্চয় নিজেকে সকলের চাইতে সেয়ানা মনে করত—তাকে জিজ্ঞাসা করা হল—"কি হে তুমি কি civilisation ও progressএর জন্যে কিছুই contribute করবে না ?" অনেক ভেবে চিন্তে, অনেক মাথা চুলকে, সে বল্লে, "আমি এমন একখানা জাহাজ করব যাতে করে'......"এই কথা বলবামাত্র dug-outসুদ্ধ লোক ত হেসে উঠলুম। আমি বল্লুম—"কেন, বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে নাকি ?"—তারপর হাসি থামলে সে বল্লে, "না—আমি একখানা এমন জাহাজ তৈরি করব যাকে সাবমেরিণের টরপিডোতে কিছুই করতে পারবে না।" কথা শুনে ফের হাসির ফোয়ারা খুলে গেল। যাদের, বন্ধুর মন কেমন করার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশয়ও ছিল, তারাও স্থির সিদ্ধান্ত করলে যে ব্যাচারির সত্যিই মন কেমন করছে। কারণ

বন্ধুবর স্বধু যে বাড়ীর দিকেই মন দিয়েছেন তা নয়, পথে বিপদসঙ্কুল সমুদ্রটা কেমন করে' পার হবেন তার মৎলবটাও ভেঁজে রেখেছেন। যাই হ'ক freedom of speech ত সবাইকার আছে, আর মনে যা হয় তা প্রকাশ হয়ে পড়েই—তাই শেষে তাকে বলা হল—"বাবাজী, তোমার safety-জাহাজের planটা একবার বাৎলাও ত?" বাবাজী বল্লেন "আমি আমার জাহাজের অর্থাৎ যে জাহাজটা করে' আমি বাড়ী যাব বুঝেছ? (বন্ধুবর যে রসিক হয়েছেন তা জানতুম না)—সেই জাহাজটার চার দিকে ১০ হাত দূরে একটা মোটা তারের জাল দেব। টরপিডো করলেই প্রথম টরপিডোটা এসে জালে বাধবে এবং fire হয়ে যাবে, আমার জাহাজের কিছুই হবে না—আর আমি তোমাদের কলা দেখিয়ে চন্দননগরে গিয়ে—commandant de port হব!" কথাটাকে আমরা আজগুবি বলেই নিলুম এবং বল্লুম "Admiralityতে গিয়ে তোমার planটা বল্লে বোধহয় তোমায় কোন্ না একটা গুঁটের Legion d' honneur (ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদক) দেবে।" কিন্তু তার ছমাস পরেই জেনেরাল জোফরে ও সচিবপ্রধান বৃয়ান্দ ঠিক সেইরকম একখানা জাহাজে করে' আমেরিকা গেছেন শুনলুম!

এ ছাড়া আর একরকম করে' জাহাজ গড়া হতে লাগল। এইসব জাহাজের তলায় হাল্‌কা হাল্‌কা এত পদার্থ রাখা হত যে টরপিডো লেগে জল ঢুকলেও জাহাজটা একেবারে ডুবত না। আমাদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরে আর একটা যে জাহাজে টরপিডো হয় সেটা এই রকমেরই জাহাজ। এই জাহাজগুলোকে আমরা Raft-vessel বা ভেলা-জাহাজ বলতে পারি।

এতদ্‌ভিন্ন আর এক রকমে টরপিডো নিবারণ করা হ'ত। জাহাজের

গায়ে একটা armour বা বর্ম্ম লাগান হ'ত। জাহাজের গা ও বর্ম্মের মাঝে ২।৩ হাত স্থান ফাঁক থাকত এবং ঐ ফাঁকের মধ্যে মধ্যে একটা একটা দরজা বা valb রাখা হত। ভ্যাল্‌বগুলো স্প্রীং দিয়ে চেপে বন্ধ করা থাকত। এইরূপ জাহাজে টরপিডোটা এসে বর্ম্মে ঠেকেই ফেটে যেত এবং তারপর যে displacement of air হ'ত সে শক্তিটা সবই সেই স্প্রীংগুলো ঠেলে valb খুলতে খুলতেই ব্যয়িত হয়ে যেত। কাজে কাজেই জাহাজের খোলের কোনরূপ ক্ষতি হত না। এইরূপে কত দিকদিয়ে যে কত রকম উপায় অবলম্বিত হয়েছিল তার আর ইয়ত্তা নেই।

পূর্ব্বে যে sea-planeএর কথা বলা হয়েছে, সেগুলো পাহারা দেবার সময় অপেক্ষাকৃত আস্তে আস্তে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে ৫০।৬০ মাইলের বেশী কখনও পাহারা দিতে পারত না। তা ছাড়া জলযুদ্ধে, Sea-plane কেবল base অর্থাৎ বাসা বা আড্ডার কাছে যুদ্ধ হলেই তাতে যোগ দিতে পারত। কিন্তু স্থলযুদ্ধের ন্যায় জলযুদ্ধেও বায়ুযান মারাত্মক। অথচ আড্ডার কাছে না থাকলে বায়ুযানের পক্ষে যুদ্ধ করা অসম্ভব! পাঠকপাঠিকা হয়ত মনে করছেন যে, যে বায়ুযান পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে' বেড়াচ্ছে তার আবার আড্ডার দরকার কি? ওটা সত্যই আমাদের বোঝবার ভুল। আমাদের গ্রাম্যসমাজে একটা কথা চলিত আছে—"খোঁটার জোরে ম্যাড়া লড়ে!" গোড়ায় জোর না থাকলে কেউ যুদ্ধ করতে পারে না। যদি যুদ্ধ করতে করতে পেট্রল ফুরুল, ত মাঝ রাস্তায় কোথা থেকে পেট্রল মিলবে? যদি কল খারাপ হল সমুদ্রের মাঝে কোথায় কারখানা মিলবে? যদি মেসিন-গানের গুলি ফুরুল, কি বোমা ফুরুল, কোথায় সে সব পাওয়া

যাবে? তা ছাড়া আহার নিদ্রা, বিশ্রামাদি ক্রিয়াও ত আছে। অতএব নৌযুদ্ধে Sea-plane যতই কাজের হক base থেকে দূরে যুদ্ধ করতে গেলে তার আর কোন দাম থাকে না। সেইজন্যে শেষকালে এমন কতকগুলো জাহাজ তৈরী হল, যাতে করে' ৪।৫খানা Sea-plane—কারখানা, রসদ, লোক, সবসুদ্ধ যেথা ইচ্ছা যেতে পারে—আবশ্যক হলেই জাহাজের কাছে এসে নামতে পারে, পেট্রল, গুলি ও বোমা নিতে পারে, কল খারাপ হলে সারতে পারে—এবং যাতে লোকজন আহার, নিদ্রা ও বিশ্রামাদিও করতে পারে। এইসব জাহাজগুলো ভবিষ্যতে moving marine-aviation baseএর কাজ করবে। এইসব জাহাজে করেও দূর দূরান্তরে গিয়ে পোষ্ট গেড়ে Sea-planeরা পাহারা দিত।

একদিকে যেমন মিত্রশক্তি, সাবমেরিণের বিরুদ্ধে এত কিছু মতলব খাটাচ্ছিলেন, জার্ম্মাণরাও তাদের সাবমেরিণকে অব্যর্থ করবার কম চেষ্টা করেন নি। কলকব্জা, মোটর, পেট্রল আদির উন্নতি ছাড়াও সাবমেরিণে তিনটী বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। প্রথমতঃ, জলে জলে খবর পাঠাবার জন্যে এমন এক বেতার-সংবাদ যন্ত্র বার হয়, যে তা দিয়ে সাবমেরিণে সাবমেরিণে অনায়াসেই সংবাদ প্রেরণ করতে পারা যেত, কিন্তু ভাসা জাহাজের বেতার যন্ত্রে কখনও সে সব খবর ধরা পড়ত না। দ্বিতীয়তঃ পোর্টের তারের জাল কেটে ঢুকবার জন্য প্রত্যেক সাবমেরিণের মাথায় একটা বড় কলের কাতুরী লাগান হয়েছিল। এই কাতুরী দিয়ে অনায়াসে আঙুলের মত মোটা তারের জাল কেটে সাবমেরিণ পোর্টে ঢুকতে পারত। তবে যে প্রত্যহ ঢুকত না, সে

কেবল চতুর্দ্দিকে মাইন ফেলা থাকত বলে'। তৃতীয়তঃ প্রত্যেক সাবমেরিণে একটা করে' Sono-metre যন্ত্র লাগান হয়েছিল। এই যন্ত্র সাহায্যে বহুদূর হতে জাহাজের চাকার বা Sea-planeএর মোটরের শব্দ ধরা যেত। এরূপ আরও যে কত কৌশল অবলম্বিত হয়েছিল তা আমরা সব জানি না।

ধরুন একটা সাবমেরিণ Bombay-Marseilles লাইন ধরে' ধরে' ভূমধ্যসাগরে ঘুরছে। এমন সময় একটা জাহাজ Port-Said বা মাল্টা থেকে ছাড়ল। মাল্টা বা পোর্টসৈয়দে জার্ম্মাণ-গোয়েন্দার অভাব ছিল না। তখনি গোয়েন্দার দ্বারা জলের বেতারযন্ত্রে সেই সাবমেরিণটা খবর পেলে অমুক সময় অমুক জাহাজ অমুক জায়গা থেকে ছেড়ে অমুক দিকে গেছে। সংবাদ পাবামাত্র সাবমেরিণটা জাহাজের লাইন ধরে' ধরে' ঘুরতে লাগল। হঠাৎ হয়ত বহুদূর থেকে দেখতে পেলে জাহাজটা আসছে, তখনি সে ডুবে পড়ল। ডুবে ডুবে আসতে আসতে প্রথম তার Sono-metre যন্ত্রে জাহাজের চাকার শব্দ ধরা পড়ল। তখন সেই শব্দ অনুসরণ করে' সাবমেরিণটা ডুবে ডুবে জাহাজের সন্নিকটবর্ত্তী হ'ল। তারপর ক্রমে ক্রমে আরও নিকটে এসে শব্দ শুনে জাহাজটার সমান্তরাল গতি নিলে। এবং তার speedটা কমবেশী করে' জাহাজটার সমান করে' নিলে। যখন এইসব ঠিক হ'ল তখন আবার ঐ Sono-metre যন্ত্রের সাহায্যে, নিমজ্জিত অবস্থায়ই, সাবমেরিণের কাপ্তেন ঠিক করে' নিলেন জাহাজের ইঞ্জিনটা ঠিক কোন্‌খানে। তারপর Alarm bell পড়ল। নাবিকরা যে যার যুদ্ধস্থানে (post de combat) গিয়ে দাঁড়াল। এমন সময় হয়ত অর্ডার হ'ল, "Tube No 2, prepare !" Tube No.

হুয়ের লোকেরা টিউবে টরপিডো পুরে কলকব্জা সব ছোঁড়বার মত করে' রাখলে। এদিকে ঐ Sono metre যন্ত্রে শুনে শুনে জাহাজ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাপ্তেন যখন ঠিক টিক করেচেন—তখন আজ্ঞা করলেন, "Attention !"—ঠিক সেইক্ষণেই একবার, এক বা দুই সেকেণ্ডের জন্য, periscopeটা তুলে' কাপ্তেন দেখে নিলেন যে Sono metre দিয়ে সব calculation ঠিক হয়েছে কিনা। তার পরক্ষণেই অর্ডার এলো—"Fire !" আর টরপিডোটি আপনার মেরুদণ্ডের উপর ঘুরতে ঘুরতে জলে পড়ে ডুবে ডুবে পিছনের মোটরের জোরে লক্ষ্যীভূত জাহাজের দিকে ছুটল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা হল, "Water gates, open all !" অমনি সব ট্যাঙ্কের দরজা খুলে গেল—এবং ভর্ ভর্ করে' জল ঢুকে সাবমেরিণটাকে গভীরে নিমগ্ন করল। তারপর সাবমেরিণ আপন ইচ্ছামত দিকে প্রস্থান করলে ! এদিকে দূরে শীঘ্রই একটা ভীষণ শব্দ হল—সাবমেরিণটা পর্য্যন্ত অতলতলে কেঁপে উঠল—কাপ্তেনের মুখে হাসির রেখা ফুটল—এবং যে লোকটা টরপিডোটাকে fire করেছিল সে উন্মত্তের ন্যায় বগল বাজিয়ে নাচতে সুরু করলে,—কারণ এই খবর দেশে পৌছাবামাত্র, তার স্ত্রীর হাতে, "Deutches Land" * হাজার স্বর্ণমার্ক গুণে দিয়ে আসবে !

* জার্ম্মাণরা ভক্তিভরে তাদের পিতৃভূমিকে Deutches-Land বলে' সম্বোধন করে। আমাদের দেশে "বন্দেমাতরম্" যেমন National-war-cry জার্ম্মাণদের সেই রকম,—"Deutches-Land Uber-alles !"

কিন্তু হাজার রকম কৌশল ও সাবধানতা অবলম্বন করলেও সাবমেরিণের হাত থেকে যে কেউ নিস্তার পেয়েছিল, তা নয়। এ একটা সামুদ্রিক প্লেগ, যার কোন ঔষধ নেই! ভবিষ্যতে, যে কোন ঔষধ বার হতে পারে না, তা বলছি না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যে বিশেষ কিছু ঔষধ বার হবে, তা বলে' মনে হয় না। এক একটা ধর্ম্মের মত, তন্ত্রের মত, fashionএর মত এক একটা যন্ত্রেরও একটা যুগ, একটা সময়, একটা 'পড়তা' আসে—যে সময়ে, যে যুগে, যে বাজারে—সে যন্ত্রটা "ছি ছি" না হওয়া পর্য্যন্ত, অন্য কোন যন্ত্রেরই কপাল খুলে না। প্রাণবন্ত বৃক্ষ, মানুষ প্রভৃতি প্রাণীর মত—মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রাণী—মতবাদ ও ধর্ম্মের মত "জড়-প্রাণী", যন্ত্র, system এবং fashion প্রভৃতিরও একটা প্রাণ আছে—তাদেরও জন্ম, যৌবন ও জরা আছে। যতক্ষণ একটা ধর্ম্ম, মতবাদ, system বা যন্ত্র তার যৌবনে দাঁড়িয়ে আছে ততক্ষণ তার উপর মৃত্যুর কোন আইনই, সাধারণতঃ, খাটে না। কিন্তু যখন তার দিন ফুরোয়, যখন তার জরা আসে—তখন কোথা থেকে যে কত কি দোষ, ত্রুটি, ব্যাধি তার বার হয়, বা বাইরে থেকে এসে তাকে আক্রমণ করে, যে তার আর ইয়ত্তা নেই। মনে হয় যেন মানুষটা চুম্বকের মত মরবার যত উপায় সব টেনে নিয়ে আসছে। আমরা জানি না, তাই বলি "মনে হয় যেন", কিন্তু সত্যই মানুষের ভেতর যে "মৃত্যুশক্তি" লুকিয়ে আছে সেই তখন মরবার এই সব উপায় ভেতর থেকে বার করে' বা আপনার উপর আকর্ষণ করে' আনে। তাই যখন একটা জিনিষের কাল ফুরোয়, সে personality, ধর্ম্ম, নীতি, আচার, মতবাদ, system, fashion বা যন্ত্র, যা কিছুই হ'ক না, তার বিরুদ্ধে তখন সকল কথাই খাটে—

কথায় বলে "ব্যাঙেও তখন তাকে লাথি মেরে যায়"! কিন্তু এই জিনিষটাই যখন যৌবনাবস্থায় ছিল, তখন তার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কাছে সকলকেই মাথা নোয়াতে হয়েছে। এইরূপই সংসার!— "নসাদিদং জগদি" ইত্যাদি। তা' ছাড়া এ জিনিষটা ভাল বই মন্দ নয়। মৃত্যু না হলে ক্রমোন্নতি হত না। নইলে—পৃথিবীটা একদিন মানুষে মানুষে "jammed" হয়ে যেত, সমুদ্রটা মাছে মাছে পচে উঠত! এই পরিবর্ত্তন, মৃত্যু, mutation, transmutation, metamorphosis, যেরূপেই সাধিত হ'ক, এইটা জীবন-বিকাশ ও উন্নতির জন্য একান্ত দরকার। তাই হাজার মনে দুঃখ হলেও, এ মৃত্যুটাকে বরণ করে' নিতেই হয়। এই মৃত্যুর বা ধ্বংসের যে দেবতা তাই তাকে শাস্ত্রে শিব বলেছে। এবং ইনি আমাদের পুরাণে প্রজাপতি দক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে আপনার আবশ্যকতা বেশ বস্তুতন্ত্র ভাবেই প্রমাণ করে' দিয়েছেন।

কিন্তু যাক সে কথা। আমরা বলছিলুম যে, মৃত্যু বলে' যে শক্তি, সে জীবনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে—এবং একটা জিনিষের কাল বা কাজ, না ফুরোন পর্য্যন্ত তার আর মরবার কোন ভয়ই নেই। সাবমেরিণের এখন যৌবনদশা—তাই মনে হয় না, যে তাকে হঠাৎ কেউ জব্দ করতে পারবে। তা'ছাড়া তার কাজ এখনও শেষ হয় নি। সাবমেরিণ, গ্যাস, বায়ুযান, খাত, এই সবগুলোকে যে মারবে সে শক্তি এখন কোথায় কোন্ অদৃশ্য জগতে লুকিয়ে আছে। এদের এখন যুগ বা পড়্‌তা—এখন এদের হটায় কে?

কিন্তু এই সারা যুদ্ধকালে, অন্ততঃ একবার জার্ম্মাণ সাবমেরিণ হার মানতে বাধ্য হয়েছিল। সে মাত্র একবার, যখন আমেরিকানরা

লক্ষে লক্ষে ফ্রান্সের সীমান্তরালে ছুটে এসেছিল—মানবজাতির বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে—যে উদ্দেশ্যটা তারা যুদ্ধশেষে বিপরীত ভাবেই সফল করেছে। সে নবশক্তি-প্রবাহ জার্ম্মাণ সাবমেরিণ যদি রোধ করতে পারত ত পৃথিবীর ইতিহাস আজ অন্যরূপেই লিখিত হত!

পূর্ব্বেই বলেছি সাবমেরিণের এখন যৌবন দশা, তাই তার হার হওয়াটা যেন অস্বাভাবিক ও অসত্য বলেই মনে হয়। কিন্তু আমেরিকার লোকও সাধারণ মানুষ নয়! একটা ২০০ বছরের জাত যে কি করতে পারে, তা মান্ধাতার আমলের আমাদের পক্ষে বুঝে উঠাও শক্ত! তাদের আকাশ জোড়া আশা, বিশ্ব জোড়া প্রাণ! আমরা পূর্ব্বেই এক জায়গায় বলেছি, যে সাবমেরিণকে আটকান যায় না তার প্রধান কারণ সমুদ্রটা অত্যন্ত বড়। কিন্তু আমেরিকানরা সেই বিশাল আটলানটিকটাকে তাদের সৈন্য পার করবার সময় গোষ্পদ-ইব করে' তুলেছিল। বিশ্বের যত জাহাজ সব requisition করে' প্রতি ২৫ মাইল অন্তর এক একটা picket বা থানা বসিয়ে এবং প্রতি পিকেটে দুই তিন খানি জাহাজ রেখে পাহারা দিয়ে আমেরিকানরা আটলান্টিকের মধ্যে একটা সুরক্ষিত পাকা সড়ক তৈরী করে' তুলেছিল, যে রাজপথের ভেতর দিয়ে কাতারে কাতারে আমেরিকান সৈন্য, আমেরিকান কামান, আমেরিকান অর্থ ও অন্ন এসে এক বৎসরের মধ্যে জার্ম্মাণীকে হারিয়ে দিলে। প্রথম যেদিন একটা মাল জাহাজে করে' লুকিয়ে এসে, আমেরিকান নৌসেনাপতিদ্বয়, লয়েড জর্জ্জের সঙ্গে দেখা করলেন, সেদিন লয়েড জর্জ্জ বলেছিলেন যে, মিত্রপক্ষের যত জাহাজ মারা গেছে তাতে এক জাহাজ অভাবেই তাঁরা তিন মাসের মধ্যে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, যদি আমেরিকানরা এসে এখনি

যুদ্ধে যোগদান না করে। তারপর আমেরিকা যুদ্ধে নামল এবং লক্ষ লক্ষ সৈন্য, কোটি কোটি টাকা, অসংখ্য কামান এনে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পাল্লাটা এমনই ঝুঁকিয়ে দিলে, যে তারা হার মানতে বাধ্য হল। অবশ্য আটলান্টিকে যে এই সময় সৈন্যবাহী জাহাজ মরে নি তা নয়। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে এমনি উপায়ে যে আমেরিকানরা এমন বস্তুতন্ত্রভাবে যুদ্ধে যোগ দিতে পারবে এই অসম্ভব ব্যাপারটা আগে কেউ ভাবতে পারে নি। তবে এ কাজ আমেরিকানদেরই খাটে! কেননা তারা অসম্ভব বলে' কিছু আছে মনে করে না।

প্যানসিল্‌ভ্যানিয়ার এক বন্দরে একবার জাহাজ গড়া হচ্ছে—এই এবার যুদ্ধের সময়—এমন সময় শীত এসে কারখানা ও yardটাকে এক হাঁটু বরফে ঢেকে ফেললে। সেই সময় যখন একজন কর্ম্মচারী ডকের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারকে গিয়ে বললে—"সাহেব আর জাহাজ গড়া চালান অসম্ভব", তখন তিনি মাটিতে বুটের ঠোক্কর মেরে' চেয়ার থেকে তিন হাত লাফিয়ে উঠে বল্লেন, "তুমি আমেরিকান হয়ে এই কথা বল্লে?" তারপর সেই কর্ম্মচারীকে তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তখনি বহু মাইল বিস্তৃত yardটাকে ষ্টিমপাইপ দিয়ে ছেয়ে ফেললেন। বরফও পড়তে লাগল আর ষ্টিমের তাপে তা উপেও যেতে লাগল, শেষে Nature, বিজ্ঞানের কাছে হার মানতে বাধ্য হল!

একটা লোক সে একহাতে জাহাজ চালায়—ডেষ্ট্রয়ারের কাপ্তেন—অপর হাতে আফ্রিকার এক নগণ্য বন্দরে গিয়ে তার মেসো Harry & companyর ক্যানভ্যাস করে, দুপুর বেলায় বসে' সে ভাল ভাল নভেল লেখে, আর রাত্রে খাবার পর Kantএর ভাগবতনীতি ও

দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করে।—এই হচ্ছে আমেরিকার মানুষ! এরা নিজেদের স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম ত্যাগ করার চাইতে—Feudal Europeএর পুরুষানুক্রমের পৈত্রিক-ভিটে ছেড়ে—"heart within and God overhead" বলে'—আমেরিকার ভয়াল জন্তু ও হিংস্র মানবপূর্ণ জঙ্গলে গিয়ে মরাকেও শ্রেয় বলে' গ্রহণ করেছিল। তারপর স্ত্রী পুরুষে যুদ্ধ করে', খেটে ও পড়ে-শুনে আজ তারাই একটা নতুন মহাদেশ ও সভ্যতা গড়ে' তুলেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বায়ুযান

বায়ুযান বা চল্‌তি কথায় ব্যোমযান *—ইংরাজীতে যাকে বলে aeroplane—প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম সচল বায়ুযান, দ্বিতীয় স্বল্পচল বা অচল বায়ুযান। প্রথম দলে (১) Hydroplane (হাইড্রোপ্লেন্) এবং ঐ জিনিষই আকারে বড় (১ক) Zeppelin (জেপ্লিন্); দ্বিতীয় দলে (২) aeroplane (এরোপ্লেন্), যার দুখানা পাখা থাকল সেটা হল (২ক) Monoplane (মনোপ্লেন্) এবং যার দুথাকে দুই দুই করে' চারখানা পাখা থাকল সেটা হল (২খ) Bi-plane (বাইপ্লেন)। নিম্নে, উপরের কথাগুলো সহজে বোঝবার মত করে' দেওয়া গেল।
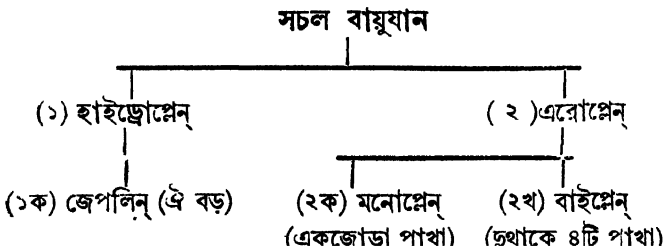
* ব্যোম মানে যদি আকাশ হয়, তাহলে ব্যোমযান কথাটা ভুল যেখানে হাওয়া নেই সেই শূন্যে যাবার যান এখনও বার হয় নি

ফরাসী "Colonel Renard" (কলোনেল রেণার্ড) এবং জার্ম্মাণ 'জেপ্লিন্' উভয়েই এই হাইড্রোপ্লেন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ফরাসী "Bleriot" (ব্লেরিও) মনোপ্লেনের দৃষ্টান্ত। ইংরাজী "Wright" (রাইট্), ফরাসী "Voisin" (ভোয়াজ্যাঁ), জার্ম্মাণ "Gotha" (গোথা) ও "Fredritchshafen" (ফ্রেডেরিচস্হাফেন্) "বাইপ্লেনের" দৃষ্টান্ত।

"কলোনেল রেণার্ড", "জেপ্লিন্," ও "ব্লেরিও" এগুলি উদ্ভাবন কর্ত্তাদের নাম। "রাইট" ও "ভোয়াজ্যাঁ" সখের নাম। "গোথা" ও "ফ্রেডরিচস্হাফেন্" কারখানার নাম। তাছাড়া প্রতিদেশে আরও নানা রকম সচল বায়ুযান আছে। তবে এগুলো মোটামুটি এক একটা টাইপ বা শ্রেণীর নমুনা।

অচল বা স্বল্পচল বায়ুযানের মধ্যে "বেলুনই" একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল।

একটা বায়ুযানে প্রধানতঃ দুটো জিনিষ থাকা দরকার। প্রথম হাওয়ায় ভাসবার একটা উপায়, দ্বিতীয় চালাবার উপায়।

বেলুনে কেবল একটা জিনিষই আছে—অর্থাৎ প্রথমটা, ভাসবার উপায়। দ্বিতীয়টা নেই—কারণ বেলুন চলে না। এই বেলুনের কথাই প্রথম বল্‌ব। কারণ এই বেলুনই হ'ল বায়ুযানের আদি—তারপর হাইড্রোপ্লেন, তারপর মনোপ্লেন ও বাইপ্লেন। একটা ফানুসকে যদি একটা ঘরের মত বড় করা যায় সেটা হল একটা বেলুন। বেলুনের দুটো অংশ একটা ফানুস দ্বিতীয়টা ঝোলা। ফানুসটা পাতলা অয়েল ক্লথের তৈরী। ঝোলাটা ঠিক ফানুসের তলায় ঝোলান। এইখানে দর্শকরা দুর্ব্বীণ নিয়ে বসে' শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে। ফানুসটা হাইড্রোজেন বা অন্য কোন হাওয়ার

চাইতে হাল্কা গ্যাসে ভরা। ফানুসটাকে দুটো শক্ত দড়ি দিয়ে নীচে খোঁটায় বেঁধে রাখা হয়। দরকার হলে টেনে নামান যায়। দড়ি নোল দিলে বেলুনটা উপরে উঠে যায়—তাহলে দর্শকরা অনেক দূর পর্য্যন্ত, কখন কখন পাহাড়ের মাথা ডিঙ্গিয়েও দেখতে পায়। আবশ্যক হলে গুণ টেনে বেলুনটাকে কিছুদূরে নিয়ে যাওয়া যায়। এইজন্য বেলুনটাকে অচল বা স্বল্পচল বায়ুযান বলা যেতে পারে।

হাইড্রোপ্লেনে থাকে একটি বেলুন ও নীচের ঝোলায় একটা বা আরও বেশী মোটর। * হাইড্রোপ্লেনরা চলতে পারে, এমন কি হাওয়ার বিরুদ্ধেও। তবে খুব ঝড়ে কোন বায়ুযানই টেঁকে না। শুধু বায়ুযান কেন, পাখীরাও বেশী ঝড় হবার পূর্ব্বে নীচে নেমে পড়ে। সকল প্রকার বায়ুযানেরও ঝড়-জল আসছে দেখলে তাই করা কর্ত্তব্য। যাক সে কথা। আমরা বলছিলুম হাইড্রোপ্লেন মোটরের জোরে চলে। মোটরের জোরে চলতে হলেই দুটো জিনিষের দরকার হয়; (১) হাল ও (২) চাকা—ঠিক যেমন মোটরবোটে থাকে। হালটা যথারীতি পিছনে থাকে, কিন্তু চাকাটা থাকে ঝোলার সামনে। ইলেক্‌ট্রিক পাখাকে খাড়া করে, vertically, বসালে ঠিক হাইড্রোপ্লেনের পাখার মত দেখতে হয়। ঐ পাখা হাওয়া কেটে চলে। কখন কখন একটার জায়গায় দুটো বা ততোধিক ঝোলা থাকে এবং প্রতি ঝোলায় মাঝি, মিস্ত্রি, দর্শক, বোমাওলা, বোমা, মেসিনগান ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য থাকে। একটা ৯,০০০ কিউবিক মিটার (বড় হাইড্রোপ্লেনের ফানুসের মাপ) হাইড্রোপ্লেন, ২১০ ঘোড়ার জোর (Horse power) মোটর (মোটরের

---

* সাবমেরিণের মত, সেই একই কারণে বায়ুযানে বহু মোটর থাকে।

মোট ওজন ৭০০ সের) হাঁকিয়ে, প্রায় ৯,০০০ সের মাল, লোকজন, machine Gun, বোমা, Petrol ইত্যাদি নিয়ে, ঘণ্টায় ৫৪ কিলো-মিটার বা প্রায় ৩৩৻৴০ মাইল বেগে ছুটতে পারে। তাছাড়া ঝোলার ভেতর অনেকগুলি নম্বর করা বস্তা-বাঁধা বালি থাকে। ফানুসের হাইড্রোজেন গ্যাসের জোরে কতকটা দূর বায়ুযানটা ওঠে, কিন্তু আরও বেশী উঠতে হলে এই বালির বস্তাগুলো ফেলে দিতে হয়। তখন অপেক্ষাকৃত হাল্কা হয়ে যানটা আরও উপরে ওঠে। নামবার সময় ফানুসের গ্যাস একটু ছেড়ে দিতে হয়, তারপর মাটির কাছাকাছি হলে কয়েক বস্তা বালি ঝোলা থেকে ফেলে দেওয়া হয়। তখনি যানটা থমকা খেয়ে যায় ; কারণ হঠাৎ হাল্কা হওয়ায় উপর দিকে একটা টান পড়ে। কিন্তু inertiaয় যানটা আবার আস্তে আস্তে মাটীতে নেমে পড়ে।

এরোপ্লেনেও এইরূপ (১) একটা ভাসাবার উপায় ও (২) একটা চলবার উপায় আছে। দুখানা বা চারখানা alluminium বা অন্য কোন হাল্কা জিনিষের পাখা—পাখার উপর রবারের নেকড়া দিয়ে ঢাকা। খোলটাও খুব হাল্কা। এই পাখার সঙ্গে জোড়া নৌকোর মত খোলটাতে মোটর থাকে, একটা বা দুটো। সামনে চাকা ও পিছনে হাল।

একটা "রাইট" বাইপ্লেন, ২৫ ঘোড়ার জোর মোটর হাঁকিয়ে পাখা, খোল, মোটর, বোমা, মেসিনগান, পেট্রল, ইত্যাদি সমেত মোট ৫২০ সের মাল নিয়ে সেকেণ্ডে ১৮ মিটার অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ৪০৷৷০ মাইল ছুটতে পারে। একটা "ব্লেরিও" মনোপ্লেন, ৪৫ ঘোড়ার জোর মোটর হাঁকিয়ে, মোট ৩৯০ সের ওজন নিয়ে সেকেণ্ডে ২৮ মিটার অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ৬৩ মাইল বেগে ছোটে। সাধারণতঃ একটু জোর যখন হাওয়া দেয়, তখন হাওয়াটা প্রায় সেকেণ্ডে ১৫ মিটার করে' ছোটে। অতএব দেখা

যাচ্ছে যে, যে হাওয়ায় একটা জেপ্লিনকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে (কারণ জেপ্লিনের ১৫ মিঃ-প্রতি—সেঃ এর বেশী speed বিরল) সে হাওয়ায় মনোপ্লেন বা বাইপ্লেন হাওয়ার বিরুদ্ধেও কাজ করতে পারে।

মনোপ্লেনে সাধারণতঃ একজন লোক এবং বাইপ্লেনেতে দুই বা ততোধিক লোক থাকে। বেশী মাল নিলে পেট্রল বেশী খরচ হয়ে যায় বলে' বাইপ্লেন ও মনোপ্লেনে অপেক্ষাকৃত একহারা, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ ও দৃঢ়স্নায়ু লোক পছন্দ করা হয়।

এখন কথা হচ্ছে এরোপ্লেন, যেটা হাওয়ার চাইতে ভারি, সেটা উড়ে কি রকম করে'। ঠিক যেমন করে' পাখীরা উড়ে। এই পাখী দেখেই অবিকল এরোপ্লেন তৈরী করা হয়েছে। পাখীদের ওঠবার, নামবার, ফেরবার, ঘুরবার, মায় আকাশে ডিগবাজীখাবার কায়দা-গুলো পর্য্যন্ত এরোপ্লেনের মাঝিরা অভ্যাস করে। শকুনি যখন উড়ে তখন প্রথমে কিছুদূর ছুটে, তারপর পাখা ছড়ায়, তারপর পাখাগুলো একটু উপর নীচে বাঁকিয়ে দেয়—Dynamicsএ একে বলে angle of ascension—তারপর একটু মাটী ছাড়া হলে পাখা নেড়ে, ল্যাজ (হাল) ঘুরিয়ে, উপরে ওঠে; তারপর চক্র দিতে দিতে আরও উপরে উঠে যায়। এরোপ্লেনও প্রথম মোটর in action করে, তারপর সাম-নের চাকা ছাড়ে,—চাকা ঘুরতে থাকে—তখন সামনের দিকে টান ধরে। এদিকে ব্রেক খুলে' দেয়।—আর যানটা মাটির উপর পাছা ঘসড়ে ছুটতে থাকে। পাশের পাখা আগে থেকেই খোলা থাকে, কিন্তু ঠিক এই সময় পাখাটাকে একটা angle of ascension দেওয়া হয় আর যানটা মাটি ছেড়ে উপরে উঠে। তারপর শকুনির মত চক্র দিতে দিতে এরোপ্লেনটা আরও উপরে উঠে যায়। পাখা একটু সামনে উঁচু, পিছনে

নীচু করলেই, হাওয়াটা যানটার নীচে ঠেলা মারে কাজেই যানটা উপরে উঠে। সাঁতার কাটবার সময় যেমন শরীরের মাথার দিকটা জলের উপরে এবং পায়ের দিকটা নীচে করে' রাখলে তবে সোজা হাত টেনে, শরীরের তলার দিকের টানটা কাটিয়ে, জলের উপরে সাঁতরে যাওয়া যায়, এখানেও ঠিক সেই কারণেই এরোপ্লেনের পাখাটা সামনে উঁচু পিছনে নীচু করতে হয়।

গণিতের ভাষায় বললে এই বলতে হয় যে—"Resistance of air on a moving plane acts along the normal (perpendicular) to its surface." এর সরল বাংলা এই যে, উপর পানে ডানা হেলিয়ে ছুটলে উপরে উঠে পড়তে হয়। ঠিক এই সিদ্ধান্ত অনুসারে একটু উপর পানে বেঁকিয়ে খোলামকুচি জলে ছুঁড়ে মারলে তবে সেটা ছিনিমিনি কাটে।

নামবার ব্যাপারটাও ঠিক শকুনির মত। উপর থেকে ঘুরে ঘুরে ত নামবার যায়গাটার নিকটে এলো। তারপর যায়গাটার চার ধারে দুই চার পাক দিয়ে যায়গাটা বেশ করে' দেখে নিলে। তারপর ডানাটা সামনে দিকে নীচু করে' মাটীর কিছু কাছ পর্য্যন্ত এসে অমনি ডানা দুটো উপরে তুললে, আর যানটা নামতে নামতে থমকা খেয়ে গেল। তারপর শকুনি যেমন টুপ করে' মাটিতে লাফিয়ে পড়ে কয়েক পা inertia'য় থপ্ থপ্ করে' লাফিয়ে গিয়ে তবে থামে—এরোপ্লেনও মাটির উপর যত আস্তে পারে নেমে, তারপর পাছা ঘসড়ে কিছু দূর গিয়ে তবে থামে। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে একটু ফাঁকা মাঠ না হ'লে এরোপ্লেন নামতে বা উঠতে পারে না।

এরোপ্লেন ও হাইড্রোপ্লেনে তুলনা করলে প্রথমেই দেখা যায় যে

হাইড্রোপ্লেনে খরচ অতিরিক্ত বেশী। ফানুসটার প্রতি কিউবিক মিটার (১৯১১ খৃষ্টাব্দের হিসাবে—এখন নিশ্চয় এর ৩।৪গুণ বেশী) ১০০ ফ্র্যাঙ্ক বা ৬২॥০ টাকা। অতএব একটা ১০,০০০ কিউবিক মিটার জেপ্‌লিনের .মত বড় হাইড্রোপ্লন্‌ করতে অন্ততঃ ১০ লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক বা ৬॥০ লক্ষ টাকা পড়ে। কিন্তু একটা ভাল এরোপ্লেন (দুজন-কার বসবার মত) দুটো মটর ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নিয়ে ২০০ কিলো-মিটার না থেমে চলবে—তার দাম মাত্র ৪০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক বা ২৫ হাজার টাকা।—আমাদের দেশের অনেক ধনবান্‌ ব্যক্তি প্রত্যেকে সকালে-বিকালে সস্ত্রীক হাওয়া খাবার জন্য একটা এরোপ্লেন রাখতে পারেন।

এই ত গেল হাইড্রেপ্লেনের প্রথম অসুবিধা। তা ছাড়া যেখানে এরোপ্লেনকে মারা অসম্ভব, হাইড্রোপ্লেনকে সেখানে চোখ বুঁজে গোলায় বা machine-gunএর গুলিতে মারা যায়। হাইড্রোপ্লেন বেশী উপরেও উঠতে পারে না—হাওয়া দিলেই বৃহৎ শরীর নিয়ে মুস্কিল! এক দূরে Reconnaisance ভিন্ন হাইড্রোপ্লেনের কোন মূল্য নেই। আমরা যে জেপলিনের নাম শুনেছি, সেগুলোও কিছু নয়। তবে প্রথম প্রথম লণ্ডনের উপর বোমা ফেলে, সেগুলো একটা moral effect করেছিল—অর্থাৎ লোককে ভয় খাইয়ে দিয়েছিল। পূর্ব্বেই বলেছি বড় কামান জার্ম্মাণ "Bertha" (৫০ মাইল দূর থেকে যা গোলা চালায়) বা জার্ম্মাণ জেপলিন এর কোন দামই নেই—আজকালকার যুদ্ধে—যদিও জার্ম্মাণরা সব জিনিষটাকে অতিকায় করতে কতই না চেষ্টা করেছিল।

পূর্ব্বেই বলেছি Tata Company সপ্তাহে ডজন ডজন aeroplane করতে পারে; কিন্তু Hydroplane করা বড় খুঁটিনাটি ব্যাপার। তারপর aeroplane একটুখানি যেমন হোক মাঠ পেলেই নামতে পারে কিন্তু Hydroplane-এর জন্য চাই পাহাড়ের উপর মাঠ। তারপর ১০,০০০ কিউবিক মিটার জিনিষটাকে রাখবার ঘর চাই। কিন্তু এই লুকোচুরির (camouflage-এর) দিনে অতবড় Hangar কোথায়ই বা করা যায়—কেমন করেই বা তাকে ঢাকা দেওয়া যায়।—কিন্তু একটা এরোপ্লেনকে আমাদের গোয়ালঘরে অনায়াসে লুকিয়ে রাখা যায়। মোট কথায় এখনও যারা হাইড্রোপ্লেন তৈরি করেছে—সেটা কোন কারণের জন্য নয়—কেবল সংস্কার বশে।

সপ্তম অধ্যায়

লড়ায়ের আবশ্যকতা ও তাহার ভবিষ্যৎ

অন্তরের প্রেরণা ও জগতের অবস্থা, এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই জীবন। ভগবান ও পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে' নিত্য নূতনতর সমতার প্রতিষ্ঠা করাই জীবনের উদ্দেশ্য।—এই জীবনে প্রতিমুহূর্ত্তে অন্তরের চাওয়া ও জগতের অবস্থার সঙ্গে ভীষণ ঘাত প্রতিঘাত চলেছে। বস্তু ও শক্তির সংঘর্ষের ভিতর দিয়েই সৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে। এই অনন্ত সংগ্রাম এটা জগতের ধর্ম্ম—উন্নতির সোপান—সৃষ্টির কৌশল।

* * *

এই অবিরাম যুদ্ধের মধ্য দিয়েই প্রাণী জীবনের ক্রমবিকাশ হয়েছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে, জীবনযুদ্ধ, ক্রমবিকাশের একটী প্রধান কারণ।

এই অবিরাম যুদ্ধের মধ্য দিয়েই সকল দেশে ক্রমমিকাশ সাধিত হচ্ছে। যারা এই জীবনযুদ্ধকে বরণ করে' নেয়নি, তারা আজ জীবনমৃত অবস্থায় অবস্থান করছে।—ত্বরায় জীবন সংগ্রামকে মাথায় করে' না নিলে তাদের ধরাপৃষ্ঠ হতে অন্তর্হিত হতে হবে।—

* * *

কিন্তু ভগবান কোন্ কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে, কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করছেন, তা আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও অল্প পরিসর দৃষ্টির অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণতা দিয়ে কি বুঝব?

এই পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটী বৎসর। আমরা পুকুরে যে গেঁড়িগুগলি দেখি তাদের জাতটা আজ প্রায় কোটী বৎসর পৃথিবীর বুকে বুক ঘসে বেড়াচ্ছে।—আমরা এই হাজার দশেক বৎসর ক, খ, পড়তে শিখেছি মাত্র। এই স্বল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে সেই পরাৎপর পুরুষের উদ্দেশ্যের কি নিরাকরণ করব!—এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে কি পরাৎপর পুরুষকে বুঝে শেষ করা যায়? এক সেরা ঘটিতে কি এক সমুদ্র জল ধরে?—

* * *

লড়ায়ের আবশ্যকতা আছে কি না তার সমাধান মানুষ কি করে' করবে। মানুষের ইচ্ছায় কি লড়াই হয়?—না আর কারো ইচ্ছায়? ইউরোপীয় মহাসমর কার ইচ্ছায় বেধেছিল? আমার মত, কারও ইচ্ছায় নয়—অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছায়।

* * *

পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেহ বা প্রেম ও শান্তিকে জীবনের একমাত্র লক্ষণ বলে' বর্ণনা করেছেন, কেহ বা শক্তি ও আধিপত্যকে জীবনের উপাস্য বলে' নির্দ্দেশ করেছেন।—তাঁদের শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে আবার এই সব কথা নিয়ে গালাগাল এমন কি মারামারি পর্য্যন্ত চলে।

এইসব দেখে শুনে মানুষের দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হয়েছে যে তাঁরা কেউই সত্যকে জানতে পারেন নি—সত্যকে পরিপূর্ণ ভাবে কেউই প্রকাশ করতে পারেন নি। শিষ্য সম্প্রদায় ত আদৌ নয়!

* * *

প্রেম ও শান্তির জীবনে আবশ্যকতা আছে। প্রেম ও শান্তির উপাসনা করলে একরূপ ফল পাওয়া যায়।

শক্তি ও আধিপত্যেরও জীবনে আবশ্যকতা আছে। শক্তি ও আধিপত্যের উপাসনা করলে অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

* * *

যাঁরা জীবনে একমাত্র শক্তি ও আধিপত্যের উপাসক তাঁরা কখনো সত্যকে পান না—তাঁরা নিরয়গামী হন। নিরয়—অজ্ঞানতা। যাঁরা জীবনে একমাত্র শান্তির উপাসক তাঁরা কখনো সত্যকে পান না। তাঁরা ইহজীবনে বঞ্চিত হয়ে পরজীবনে নিরয়গামী হন।

* * *

প্রেম ও শক্তি, শান্তি ও আধিপত্য, এ উভয়ের মধ্যে যিনি সমতা স্থাপন করতে পেরে ছেন, তিনিই যোগী, ঋষি, তত্ত্বদর্শী—তিনিই সত্যকে পেয়েছেন।

এইরূপ সত্যকাম মানুষ প্রেম ও শান্তির উপাসনার দ্বারা অমৃতত্ব এবং শক্তির উপাসনার দ্বারা ভোগ ও আধিপত্য লাভ করেন।

এই মুক্ত, স্বাভাবিক, ভাগবৎ ভোগ ও আধিপত্যই জীবনের নিগূঢ় লক্ষ্য।

* * *

একটা আদর্শ না হলে একটা জাত বাঁচতে পারে না। সে পুরুষোত্তম হতে নুড়ি পর্য্যন্ত যা কিছুই হ'ক না কেন। এই আদর্শকে রক্ষা করতে গিয়ে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েই হয়েছে মানুষের সভ্যতা, মহত্ত্ব—জাতীয়তা। এই আদর্শের উপর যখন দুর্বিনীত একটা রাক্ষস এসে নির্ম্মম পদাঘাত করে, জাতির অন্তরস্থিত প্রাণশক্তিকে তখন অস্ত্র ধারণ করতেই হয়। একটা খণ্ড "মতে" অনুরক্ত হয়ে জাতি কি তার প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে?

মানুষ, প্রেমের শক্তিতে অভিভূত হ'য়ে পড়ে—কারণ তার ভেতর প্রেম আছে, কেবল অহংকারাদিতে চাপা পড়ে'। প্রেমের শক্তিতে মানুষকে জয় করা যায়। কিন্তু যে অসুর, তার অহং-বর্ম্ম ভেদ করে' প্রেম তার অন্তর পর্য্যন্ত পৌঁছোতে পারে না। তাই যুগে যুগে অসুর ধ্বংসের জন্য ভগবানকে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছে। বজ্রাঘাতে তার অহং-বর্ম্ম ভিন্ন করে' না দিলে, অসুরের কখনো মুক্তি হয় না।

*　　　　*　　　　*

জীবন-পথে চলতে চলতে এমন একটা সময় এসে পড়ে, যখন হয় আদর্শকে ছাড়তে হয়, নয় যুদ্ধ করে' জীবনের আদর্শটিকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করতে হয়—ইহাই ধর্ম্ম।

*　　　　*　　　　*

যে জাত যুদ্ধ করে না—সে জাতটার যেন রক্ত, মাংস, স্নায়ু, শিরা সবই আছে, নেই কেবল হাড়। এই হাড়ের অভাবে তাকে চিরজীবন কেঁচোর মত বুকে হেঁটেই চলতে হয়।

যে জাত যুদ্ধ করে না সে জাতের শিরদাঁড়া নেই।

*　　　　*　　　　*

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ নিয়েই মানব-প্রকৃতি। এই তিন গুণ শুদ্ধ হলে, প্রকাশ, তপঃ ও শমতায় পরিবর্ত্তিত হয়। রজঃ বা তপঃ, সত্ত্ব ও তমের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখেছে—সমতা ও শুদ্ধি বিধান করছে। এই রজঃ বা তপসের বহিঃপ্রকাশ—যুদ্ধ।

অষ্টম অধ্যায়

—*—

ভবিষ্যতের লড়াই

প্রবন্ধমালাটী শেষ হয়ে যখন ছাপা হতে চলেছে, তখন সমগ্র পৃথিবীটা আবার একটা মহাসমরের মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। বিগত ইউরোপীয় মহাসমর, হঠাৎ সকলে থামিয়ে দিতে বাধ্য হলেও—তাতে যুদ্ধের কারণগুলোর কিছুই মীমাংসা হয়নি। ইউরোপীয় সভ্যতা ও জাতীয়তার মাঝে "ক্ষত্রিয়তা" "সাম্রাজ্যবাদ" ইত্যাদি, ইত্যাদি যে সব দুষ্টব্রণ ও ক্ষত প্রকাশ পেয়েছিল, তাদের হঠাৎ শান্তির পঙ্ক চাপা দিলেও তার "জড়" ত মরেই নি, অধিকন্তু চাপা ক্ষতটা আরও বিস্তৃত হয়ে, আরও গভীর ভাবে পাশ্চাত্য জাতি সকলের রক্ত দূষিত করে', পারদ-ঘটিত রক্ত-স্ফোটকের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পেতে চলেছে। অন্যান্য আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও Biological কারণ ছাড়া বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের কারণ :—

(১) ইংরাজ জার্ম্মাণ বাণিজ্য ও সামরিক প্রতিযোগীতা।

(২) ফরাসীর জার্ম্মাণ ভীতি।

(৩) রুষের রাজনৈতিক দূরবস্থা।

(৪) বলকান্ রাজ্যগুলির অস্থিরতা।

(৫) তুর্কির অসন্তোষ।

(৬) উপনিবেশ-সম্পত্তির অসামঞ্জস্য।

আজ প্রথম কারণটী আপাততঃ নেই। এবং তৃতীয় কারণটী একটা নূতন রূপ নিয়ে ভীষণ আকারে দেখা দিয়েছে। তাছাড়া সকল কারণগুলিই সমভাবে বিদ্যমান। এর উপর আর কয়েকটী নূতন কারণ প্রত্যক্ষ-সমস্যার মধ্যে এসে অবস্থাটাকে অত্যধিক গুরুতর করে' তুলেছে। তার মধ্যে :—

প্রথম—ইংরাজী ভাষাভাষী জাতিদের মিলন এবং ইংরাজ-আমেরিকার জগতে প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা।

দ্বিতীয়—আমেরিকা ও ইউরোপ হতে জাপানীদের বহিষ্কার।

তৃতীয়—সিঙ্গাপুরে ইংরাজদের সামরিক নৌবন্দর স্থাপন।

চতুর্থ—প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকান নৌবহরের প্রভাব।

পঞ্চম—লাতিন জাতিদের ভূমধ্য সাগরে প্রাধান্য-স্পৃহা এবং সম্পূর্ণ উত্তর আফ্রিকার প্রতি পরোক্ষ লোভ।

ষষ্ঠ—মুসলমান জাতিদের পৃথিবীব্যাপী অসন্তোষ ও উত্তেজনা।

সপ্তম—(ও প্রধান)—পৃথিবীর, বিশেষতঃ জার্ম্মাণী ও রুষিয়ার অর্থ-সমস্যার ভীষণ জটীলতা।

অবস্থাটা এখন এমনি দাঁড়িয়েছে যে যুদ্ধটা বাধলেই হয়।—কিছুদিন হয়ত স্থগিত থাকলেও, এ যুদ্ধটাকে নিবারণ করা মানুষের অসাধ্য।

ইংরাজ-আমেরিকা সম্মিলনে অনেক ইউরোপীয় ও প্রাচ্য জাতির প্রাণটা সত্যই আঁতকে উঠেছে—বিশেষতঃ জাপানের।

প্রশান্ত মহাসাগরের চারধারে প্রকাশ্যে ও গোপনে এমন সব অবস্থা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে যে হয় জাপানকে নিজেই যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, নয় তাকে প্রশান্ত মহাসাগরের আধিপত্যটা ত্যাগ করতে হবে।

মেডিটেরেনিয়নেও লাতিন জাতিদের অধিপত্য-স্পৃহা এই সব কারণে এসে যোগ দিয়েছে।

তুর্কির বল বৃদ্ধিতে যুদ্ধের সময়, সুয়েজ কেনেল ও মুসলমান উপনিবেশগুলো যে ইংরাজদের ঠিক বশ্যতার ভেতর থাকবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

তা ছাড়া ইংরাজ জাতির বল ও বিশেষতঃ নৌবহর বৃদ্ধিতে পৃথিবীর সর্ব্বজাতিরই এমন একটা হিংসা হয়েছে যে তারা অন্ততঃ ইংরাজের নৌশক্তিটা নষ্ট করবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কোন দেশের রাজনীতিকগণই এই ভবিষ্য মহাসমর সম্বন্ধে অজ্ঞ নন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশের রাজনীতিকগণ এই যুদ্ধটিকে সামনে রেখে দেশের সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করছেন।

এখন দেখা যাচ্ছে যে ইংলণ্ড-আমেরিকা ভিন্ন সকল জাতির স্বার্থ আপাততঃ যেন এক।—কেবল জার্ম্মাণী সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। যদি তাই হয়, তা হলে জার্ম্মাণ-অষ্ট্রীয়া জাতি-সংহতিটাকে ভাঙবার জন্য যে জাতি-সঙ্ঘটা দাঁড়িয়েছিল—ইংরাজ-আমেরিকানদের বিরুদ্ধেও হয়ত সেই রকম একটা ষড়যন্ত্র গড়ে উঠতে পারে। তা হলে প্রশান্ত মহাসাগরে নৌযুদ্ধ এবং সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ ইউরোপে, বায়ুযুদ্ধটা খুব চলবে।

পৃথিবীর ভার অপনোদনের সঙ্গে সঙ্গে দিব্য ভবিষ্যতের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে' না তোলা পর্য্যন্ত মহাশক্তির আর বিশ্রাম নেই।—এখন মানুষের একটা আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকা দরকার।

যে শক্তিগুলো যবনিকার অন্তরাল থেকে পৃথিবীর এই সব ঘটনা-ঘটন সম্ভব করছে, তাদের শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের আর নিস্তার নেই।—বিপ্লবের পর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তারা মানবজাতিকে তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলবেই। এমন একটা সময় আসছে যখন আমাদের জীবন সম্বন্ধে ধারণা পর্য্যন্ত বদলে ফেলতে হবে।